আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তচত্বারিংশ গ্রন্থ

দ্বিতীয় পক্ষ

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩১
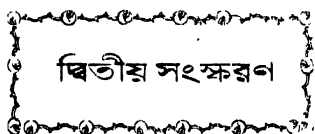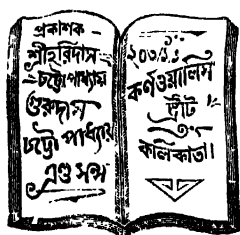
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ভূমিকা

সমাজের বা সাহিত্যের কোনও গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য আমার এ প্রয়াস নয়। যশের জগতে একটা মৌরসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার দুরাশাও আমি রাখি না।

অবসর সময়ে এই গল্পগুলি লিখিয়া আমি আমোদ উপভোগ করিয়াছি। অপর পাঠকও ইহাতে ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিতে পারেন এই আশায় ইহা প্রকাশ করিলাম। এ আশা অমূলক বলিয়া দুরাশা হইতে পারে, কিন্তু আশা করি দুষ্ট আশা বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় পক্ষ

১

রামবাবু সদরালা ; তাঁর পূরা নাম রামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী। আদালতের কাগজ-পত্র সহী করিতে-করিতে যখন তাঁর হাত অবশ হইয়া আসিত, তখন অনেক সময় তিনি নাম ও উপাধি নির্ব্বাচন বিষয়ে পিতামাতার অপরিণামদর্শিতার কথা স্মরণ করিয়া, আফ্‌শোস্ করিতেন।

তাঁহার স্ত্রী নয়নতারা দ্বিতীয় পক্ষ, তবে বেশ পাকা—পুরাতন দ্বিতীয় পক্ষ। তাঁহার গর্ভের সন্তান এখন বি-এল্ পাশ করিয়া মুন্সেফীর উমেদারী করিতেছে। প্রথম পক্ষের একমাত্র ওয়ারিশ কন্যা ঘরণী-গৃহিণী রায় বাহাদুর ডেপুটীর পত্নী। সুতরাং নিজের ঘরে নয়নতারাকে দ্বিতীয় পক্ষ সাব্যস্ত করিবার কোনও আইনসঙ্গত প্রমাণই বর্ত্তমান ছিল না।

রামবাবু সদরালা ; কর্ম্মদোষে এবং সহচরগুণে নিতান্তই হিসাবী হইবার তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু নয়নতারা বেথুন স্কুলে পড়া মেয়ে ; তায় দ্বিতীয় পক্ষ। কাজেই সে ইচ্ছা

কার্যে ...বার সুযোগ রামবাবুর বড় ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার বাড়ীঘর বেশ গোছান, আসবাবও দু'চার খান বেশ আছে। তিনি স্ত্রী-প্রসাধিত হইয়া যখন আদালতে যাইতেন, তখন তাঁহার পালিশ-করা সামিজ্, কলার এবং চোস্ত পোষাক দেখিয়া লোকে হালী ডেপুটী বলিয়া ভ্রম করিত, সদরালা তো ভাবিতই না।

রামবাবুর মেয়ে রমা ;—রামবাবু নামকরণ বিষয়ে স্ত্রীর সদ্বিবেচনার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন—শুধু রমা, 'সুন্দরী' 'অসুন্দরী' কিছুই নহে। রমা দেবী ঢাকার ইডেন হাইস্কুলে পড়ে, এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবে। নয়নতারা মেম সাহেব এবং উন্নত ব্রাহ্ম মহিলাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং নিজের হৃদয়ের যত অপূর্ণ সাধ তাহা মেয়েকে দিয়া পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। রমা সুন্দর ইংরাজী বলে, পিয়ানো বাজায়, চমৎকার ছবি আঁকে ; এ ছাড়া সে পড়া-শুনায়ও খুব ভাল। তাহার কৃতিত্বে নয়নতারা নিজেকে খুব কৃতী মনে করিতেন।

মেয়ের বিবাহের জন্য পিতামাতা অপেক্ষা আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে। নানা স্থান হইতে কুটুম্বিনীরা নানারকম ভালমন্দ পাত্রের সন্ধান দিতেছেন। পিতামাতা দু'জনেই কোনও পাত্রকেই ঠিক পছন্দ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একটি ছেলে অন্যান্য বিষয়ে অনেকটা পছন্দ হইয়াছিল ; কিন্তু তার নাম

ভববিভূতি, উপাধি মজুমদার। রামসর্ব্বস্ব নিজের নামের বোঝা স্মরণ করিয়া এ পাত্রটিকে একেবারে মন হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

ভববিভূতির আর একটা গুরুতর দোষ ছিল, যেটার জন্য নয়নতারার আপত্তি ছিল; সে আপত্তির কথা কিন্তু বলিবার উপায় ছিল না,—সে বিপত্নীক। বিবাহের দুই বৎসর পরে তাহার পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যেই গুণবতী স্ত্রী একটি কন্যারত্ন রাখিয়া গিয়াছেন;—মেয়েটি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেছে।

ভববিভূতি সরকারী ডাক্তার—বয়স বছর ত্রিশেক। দিব্য সুপুরুষ, পৈত্রিক দু'পয়সাও বেশ আছে।

২

রামবাবু সকাল-বেলায় বাজার করিয়া ফিরিতেন,—অপবাদ সত্ত্বেও তিনি এ কাজ নিজেই করিতেন—পথে দেখিলেন, তাঁহার পাশের বাড়ী, যেটা খালি পড়িয়াছিল, ধোয়া হইতেছে। তিনি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে কে এল ?" বাড়ীর একটি লোক উত্তর করিল, "হাঁসপাতালের নূতন ডাক্তারবাবু।" "কি নাম তাঁর ?" "ভববিভূতি বাবু।" "ভববিভূতি! মজুমদার ?" "আজ্ঞে হাঁ।"

রামবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে বলিলেন, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ !" তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিলেন; মোটের উপর তাঁর রক্তের গতি একটু বাড়িয়াই গিয়াছিল—কেন না নামটা মন্দ হইলেও ভববিভূতি পাত্র ভাল।

গিন্নীকে বলিলেন, "দেখ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ! ভববিভূতি ছোঁড়া বদলি হ'য়ে এই ঢাকায়ই এসেছে ; আর নিবি তো নে,—পাশের বাড়ীটাই ভাড়া নিয়েছে।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই না কি ? তা' বেশ, মন্দ কি ?" কিন্তু মনের ভিতর তাঁর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তাঁর সমস্ত জীবনটা তিনি নিজেকে একটা অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত মনে করিতেন। তাঁহার প্রতি স্বামীর যত্নের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তবু, কি জানি কেন, তাঁর মনে একটা

দারুণ অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে—রামসর্ব্বস্ব বাবুর তখন ৩৬ বছর বয়স। যৌবন আসিতে-আসিতে তাঁহার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল—আর মুন্সেফী জীবনে চল্লিশ বছরকে ঠিক যৌবনের অবস্থা বলা চলে না। রামসর্ব্বস্ববাবু অবশ্য নূতন বৌ লইয়া মাতামাতি কম করেন নাই; কিন্তু কি জানি কেন, তাঁহার মাতামাতিতে নয়নতারার মনটা তাতাইয়া উঠে নাই। তিনি মোটের উপর সুখেই ছিলেন—বিশেষ কোনও অভাবও অনুভব করেন নাই, কিন্তু স্বামিপ্রেমে পাগল হইতে পারেন নাই।

যখন যৌবন অতীত হইয়া গেল, তখন একদিন নয়নতারা প্রাণের ভিতর একটু তাপ অনুভব করিলেন—সে অনেক কথা। কিন্তু তখন তিনি গতযৌবনা, হৃদয়ের উত্তাপ কেবল একটি দীর্ঘশ্বাসে উপিয়া গেল। সেই অবধি তিনি তাঁহার বঞ্চিত যৌবনের অনুশোচনায় প্রাণের কোণে একটা ধিক্কার জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার হাস্যময় প্রফুল্ল জীবনের ভিতর এই হতাশা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইতেছিল।

একমাত্র আদরিণী মেয়েকে জীবনের ব্যর্থতার হাতে বিসর্জ্জন দিতে তাঁ'র মন সরিতেছিল না। তবে নয়নতারার বয়স হইয়াছে, বিষয়বুদ্ধিতে তিনি রীতিমত পাকিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নিছক প্রেমের হাওয়া

খাইয়া প্রাণও বাঁচে না, বেশ স্থায়ী রকমের সুখ স্বচ্ছন্দতাও হয় না। তাই কেবল প্রেমের খাতিরে এমন স্বামিলাভের সর্ব্বাঙ্গীন সৌভাগ্য হইতে কন্যাকে বঞ্চিত রাখিতেও তাঁহার বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাই তিনি যখন বলিলেন, "বেশ, মন্দ কি?" তখন তাঁ'র মনের তলায় সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনিত হইল, "মন্দ নয় কি?"

৩

ভববিভূতি পাড়া জমাইয়া বসিল। এমন এক-একজন লোক আছে, যারা আসে-যায়, তাতে কারো কিছু আসে-যায় না। ভববিভূতি সে দরের লোক নয়। সে যেখানে যায়, সেখানে সবাই প্রসন্নভাবে তা'র আগমন অনুভব করে। যেমন সূর্য্য যখন দেখা দেন, তখন অত্যন্ত মরা যে গাছপালা, তারও অঙ্গে যেন একটা পুলকের ঢেউ বহিয়া যায়, সে পুলক যেন শুধু চোখে দেখা যায়। ভববিভূতির জাঁকজমক না ছিল, তা নয়; তার গাড়ী ঘোড়া, আসবাব, চাকরবাকর সবই একটু সাধারণের চেয়ে বড় রকমের; কিন্তু সে জাঁকজমক কারো চোখে লাগিত না, সবাই সেটাকে নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ করিত। চোখে লাগিত কেবল মানুষটি। কোন-কোনও মানুষের ভিতর এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে, যাতে তা'রা সকলকে কাছে টানিয়া আনে, মরা প্রাণে সাড়া বাহির করে, আর সবাইকে ডিঙ্গাইয়া নিজের মাথা খাড়া করিয়া থাকে। ভববিভূতি সেই রকমের লোক।

অল্পদিনের মধ্যেই তা'র বেশ পসার জমিয়া উঠিল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী জমিল তা'র বাড়ীর আড্ডা। সন্ধ্যার পর হইতে তা'র অবসরের সময়,—তখন বাড়ী বন্ধুবান্ধবের হাস্যে মুখরিত থাকিত। চায়ের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্, পাশার

হুড়হুড়ানি, আর তাসের চট্‌চট্‌ শব্দ শান্ত মৃত পাড়াটার ভিতর একটা জীবনের ঢেউ খেলাইয়া দিত। কিন্তু সব চেয়ে উঁচু দরের ছিল আলাপ। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের খুব উচ্চ অঙ্গের আলোচনা হইত ভববিভূতির মজলিসে; আর তা'র প্রধান বক্তা ছিল ভববিভূতি। যেই যাহা বকুক বা বলুক, প্রত্যেক বিষয়েই ভববিভূতির কথা না শুনিয়া কাহারও উপায় ছিল না। আর তার কথায় সর্ব্বদাই এমন একটা দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা থাকিত, এমন তার ক্ষমতা ছিল সব বিষয়ে নূতন. কিছু জোর করিয়া বলিবার যে, যে শুনিত, তাহাকেই মনে-মনে নিজের খর্ব্বতা অনুভব করিতে হইত, তা সে তার মত স্বীকার করুক বা নাই করুক।

পাশের ঘরে তাস চলিতেছে। এ ঘরে বসিয়া ভব-বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া পিয়ানোর উপর হাল্কাভাবে অঙ্গুলি চালাইতেছে। ইংরেজীর প্রফেসার যোগেনবাবু ও দর্শনের প্রফেসার অমৃতবাবু রবিবাবুর "ঘরে-বাইরে" লইয়া ঘোর তর্ক লাগাইয়াছেন। যোগেশবাবুর মত যে, "ঘরে-বাইরে" উপন্যাস হিসাবে কিছু নয়, কিন্তু "fine literature"—বেশ সরল সাহিত্য। অমৃতবাবু বলেন, যেটা যা' হতে চায় সেটা যদি তা' না' হয়, তবে সেটাকে একটা ভাল জিনিস বলে গ্রাহ্য করা চলে না। খানিক-ক্ষণ তর্ক চলিবার পর ভববিভূতি পিয়ানো হইতে

ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "দেখ অমৃত বাবু, তোমাদের কথা শুনে হাসি পায়। একজন বড় পণ্ডিত বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটা-একটা লোক আছে, যারা নিজ নিজ ব্যবসার চারধারে একটা খুব বড় আর খুব গভীর খাদ গড়ে ফেলায়। তাই গড়া হ'লে তাদের আর সেই গণ্ডী পেরবার জো থাকে না। তোমাদের হয়েছে তাই। সাহিত্য ব্যবসায়ীদের Rhetoric অলঙ্কার প্রভৃতির নিয়ম হচ্ছে সেই প্রকাণ্ড খাদ। তোমরা যদি কাউকে সে খাদ ডিঙ্গাতে দেখ, তবে অস্থির হ'য়ে ওঠ, অচলায়তনের মহাপঞ্চকের মত তোমরা তোমাদের তন্ত্র-মন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে তার বিচার করতে বসো। কিন্তু যে প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী, সে তোমাদের শাসন মানবে কেন? গড়বার জন্য যাকে ভগবান পাঠিয়েছেন, সে কেবল পুতুল সাজিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে কেন? হোমার যখন ইলিয়ড্ লিখেছিলেন, তখন কি তিনি নূতন জিনিস সৃষ্টি করেছিলেন, না তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আরিষ্টটলের অনু-শাসনের সীমা স্বীকার করেছিলেন? রবি বাবুর সেই প্রতিভা আছে, যা'তে নূতন গড়তে পারে। উপন্যাস বললে যদি তোমার বাঁধি গতের জিনিসটিকেই বোঝ, তবে উপন্যাস তিনি গড়েন নি ঠিক,—গড়েছেন এমন একটা নূতন জিনিস, যেটা তা'র চেয়ে ঢের ঢের উঁচু দরের। সেটা ভাল কি মন্দ, তার বিচার করতে গেলে, তোমাদের

চিরদিনের মাপকাটী ফেলে দিয়ে criticismএর একটা খুব উঁচু ধাপে উঠতে হবে। আর্ট হিসাবে জিনিস ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সেটা বিচার করতে হবে,—সমস্ত বাঁধা formula, সব নিয়মতন্ত্র পিছনে রেখে, কেবলমাত্র আর্টের মূলসূত্র দিয়ে দেখতে হবে। সাধারণ মাপকাঠী এ সব জিনিসের নাগাল পায় না।”

তর্ক চলিল। ক্রমে দেখা গেল, অমৃতবাবুর প্রধান আপত্তি “ঘরে-বাইরে”র মত বইয়ের সামাজিক অপকারিতা লইয়া। বিমলার মত কোন স্ত্রীলোকের মনের উপর ইহা ঠিক কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তা’র একটা বেশ সম্পূর্ণ হিসাব করিয়া অমৃতবাবু সাব্যস্ত করিলেন যে, রবিবাবুর ঘাড়ে অনেক পাপ চিরদিন চাপিয়া রহিবে।

যোগেশ বলিলেন, “সমাজের মনের নামে অনেক ঝুটা মাল চলিয়া যায়; কিন্তু তুমি সমাজের ক’টা লোকের মনের খবর রাখ? তুমি যা ব’লছ, তা’ হ’লে এই ধরতে হয় যে, সমাজের ষোল আনা লোক গণ্ডমূর্খ, তারা রবিবাবুর গল্পের প্রতিপাদ্যটা বুঝবে না, কেন না সেটা সূক্ষ্ম; বুঝবে বেশ স্পষ্টভাবে সন্দীপের বক্তৃতা আর বিমলার চাঞ্চল্য; আর অম্লানবদনে সব মেয়েছেলে পরকীয়া চর্চ্চা ক’রবে।”

অমৃত বলিলেন, “সমাজের পনেরো আনা লোক যে মোটা বুদ্ধির, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।”

ভববিভূতি বলিলেন, “কিন্তু সেই মোটা বুদ্ধির দিকে

নজর রেখে যদি সবাই বই লিখতে বসে, তবে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়ের চেয়ে উঁচু দরের সাহিত্য কারো কখনও লেখা উচিত হবে না। মিথ্যাকথা কহা বড় দোষ, এই সহজ সত্যটা যদি আর একটু ঘুরিয়ে বল্লেই পাপ হয়, তবে বাল্মীকির আমল থেকে এ পর্য্যন্ত যত সাহিত্য রচনা হয়েছে, সব অতল জলে বিসর্জ্জন ক'রতে হয়। তাই যদি হ'ত, আর সেই সনাতন কাল থেকে যদি তোমার মত censorরা ব'সে এই রকম সাহিত্যের নাম কাটতে বসতেন, তবে আজ আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি Ten Commandmentsএর গণ্ডী ছাড়িয়ে যেত কি না সন্দেহ।"

আবার তুমুল তর্ক আরম্ভ হইল। "ঘরে-বাইরে"র নানা অঙ্গ, নানা দিক্ লইয়া নানা সমালোচনার পর তর্কটা আসিয়া পৌছিল বিমলা-চরিত্রের স্বাভাবিকতার আলোচনায়। অমৃত বলিলেন, "একজন সাধ্বী পতিব্রতা হিন্দু-রমণী যে হঠাৎ একটা লোকের মোহে পড়িয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িল, ইহা একান্ত অস্বাভাবিক। রবিবাবু, হিন্দু-সমাজের ভিতর ধর্ম্মের যে সুপ্ত subconscious অনুভূতি আছে, সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন।"

যোগেশবাবু বলিলেন, "ধর্ম্মের এই অন্তঃসলিলা ধারার কথা শান্তি-নিকেতনে রবিবাবুর লেখা পড়েই কি শেখ নি দাদা?"

অমৃত। কখনো না, এ কথা বহুদিন থেকেই চলে

আসছে। স্বামী বিবেকানন্দ এটা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমন কেউ করে নি।

যোগেশ। অন্ততঃ রবিবাবু যে সে কথা জানেন, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

অমৃত। তিনি জানেন, কি না জানেন, সে কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; আমি বলি তিনি এ জিনিসটার শক্তি যদি ভাল ক'রে বুঝতেন, তবে এমন অসম্ভব কথা কখনো লিখতে যেতেন না।

ভববিভূতি বলিল, "কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, সেটা তো শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হিসাব করা চলে না; তার একমাত্র প্রমাণ মানব-চরিত্রের জ্ঞান। আমরা হিন্দু ব'লে আমাদের কতকগুলা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু আমরা মানুষও বটে। আমাদের ভিতর হিন্দুত্বের চাইতে খুব বেশী প্রবল শক্তি আছে, তা' না স্বীকার ক'রে উপায় নাই। তা' ছাড়া এই যে চুম্বক-শক্তি, যাকে আমরা ভালবাসা বলি, সেটা তো আমাদের শিশু পিতৃগণের স্বভাবের উপর একটু improvement বই তো নয়। রক্তের জোর ধর্ম্মের জোরের চেয়ে খুব বেশী।

অমৃত। কিন্তু তুমি কি এই বলতে চাও যে, কোনও মানুষেরই এটা সম্ভব? রবিবাবু দাঁড় করাতে চান যে, বিমলা সত্যসত্যই নিখিলকে ভালবাসতো। তার পক্ষে

সন্দীপকে দেখবামাত্রই একটা ভাবান্তর হওয়া, আর একদম ভালবাসার উল্টাপাল্টা হইয়া যাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে ভালবাসাটা কিছু নয় ব'লতে হয়।

ভব। তুমি কাব্যের চোখে মানুষকে দেখছো, মানুষের ভিতরকার অনুভূতির চোখে নয়। কাব্যের পক্ষ অতি সোজা। তাতে সাব্যস্ত করা হ'য়েছে যে, একজন কেবল একজনকেই সত্যি ক'রে ভালবাসতে পারে;—অতএব যেখানে একজন ছেড়ে দু'জন দেখবে, সেখানেই বলবে, এই দ্বিতীয়ের প্রতি আনুরক্তি ভালবাসা নয়, একটা শারীর ব্যাপার; অথচ জগতের আদি থেকে মানুষ একাধিক লোককে ভালবাসছে। অগ্নিমিত্র দুই স্ত্রীর পর আবার মালবিকাকে ভালবাসলেন, আর কবি অম্লানবদনে সেটাকে ভালবাসার জয় ব'লে কীর্ত্তন ক'রে গেলেন। আর রোজই পুরুষেরা দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ ক'রছে। Shaw যে বলেছেন Man is a polygamous animal সে কথা যে সত্য, তা' অস্বীকার করবার উপায় নাই।

যোগেশ এ কথায় বাঁকিয়া দাঁড়াইল, সে বলিল, "এ কথা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খাটে না।"

কথায় কথায় কথা "ঘরে-বাইরে" ছাড়াইয়া দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ সম্বন্ধে তর্কে পর্য্যবসিত হইল। ক্রমে কথা উঠিল রামসর্ব্বস্ববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষকে ভালবাসেন কি না, এবং যদি বাসেন, তবে প্রথম পক্ষকে ভালবাসিতেন কি

না ; এবং নয়নতারা রামবাবুকে ভালবাসিতে পারেন কি না। অমৃত ও যোগেশ এ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক লাগাইয়া দিল।

ভববিভূতি বলিল, "ভালবাসাটা মনের জিনিস। বাইরের লক্ষণ দেখে সেটার সম্বন্ধে যখন নিঃসংশয়ে কিছুই বলা যায় না, তখন এ নিয়ে তর্ক বৃথা। বাস্তবিক তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন কি না, তা কেবল তাঁরাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও জানেন কি না সন্দেহ, কারণ ভালবাসা ব্যাপারটা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর নির্ভর ও সেবার ভিতর এমন ক'রে মিশে যায় যে, তা'র সমগ্র সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভালবাসার বিচার করবার ক্ষমতা খুব উচ্চ অঙ্গের সূক্ষ্মদর্শিতা ছাড়া হয় না।

এমন সময় বাহিরে রামবাবুর আওয়াজ শুনা গেল। যোগেশ হাসিয়া বলিল, "Talk of the"—অমৃত বলিল, "সদরালা গিন্নীর এয়োস্ত্রীর জোর আছে হে, বুড়ো এখনো কিছুদিন বাঁচবে।"

রামবাবু খুব ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু, আমার স্ত্রী যেন কেমনধারা হ'য়ে গেছেন, একবার আসুন।"

ভববিভূতি তৎক্ষণাৎ সদরালার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। মজলিস চলিতে লাগিল।

নয়নতারার খুব বেশী জ্বর হইয়া হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তিন দিন হইল সমান জ্বর ; আজ

সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ বিকার হইয়া ক্রমে একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন। ভববিভূতি আজ সকালে দেখিয়া টাইফয়েড সাব্যস্ত করিয়া ঔষধ দিয়াছিল। এখন দেখিল, খুব খারাপ রকমের টাইফয়েড হইয়া রোগিণীর coma হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া পড়িল। নয়নতারা স্থির-বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন, আর তাঁর শিয়রের কাছে সমস্ত পরিবার ব্যস্ত হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া আছে সেবাপরায়ণা, অশ্রুমুখী রমা। তাহাকে দেখিয়া ভববিভূতির প্রাণের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার বলিষ্ঠ মন সেটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া রোগিণীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সমস্ত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল। রামবাবু ও অন্য সকলে তাহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন; সকল অনু-রোধ অবহেলা করিয়া সে রোগিণীর পরিচর্য্যা করিল।

পরদিন প্রত্যূষে সে রমাকে বিশেষ উপদেশ দিয়া বাড়ী গেল। দ্বিপ্রহরে হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়াই আবার আসিয়া বসিল। সেদিনও সমস্ত রাত্রি শুশ্রূষা চলিল।

রামবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি যা' ক'রছেন, তা' আমার ছেলেও ক'রতে পারতো না; কিন্তু আমি তো

আমাদের জন্য আপনার শরীর নষ্ট ক'রতে দিতে পারি না।"
ভববিভূতি হাসিয়া বলিল, "আমাদের মেডিক্যাল কলেজে থেকে থেকে দিনরাত্রি সমান হইয়া গেছে; আপনি চিন্তা ক'রবেন না। আপনার স্ত্রীর যে অবস্থা, এতে সর্ব্বদা খুব অভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানে শিক্ষিত নার্স ভাল নেই, কাজেই আমার এ কাজ ক'রতেই হবে। আমি তো আর রুগী মেরে ফেলে অপযশ কিনতে পারি না।" বলিয়া সে হাসিল।

রামবাবু শুনিয়াছিলেন, এ অদ্ভুত ডাক্তারটার এমনি স্বভাব। আরও দু'এক জায়গায় সে এমনি করিয়াছে। তৃতীয় দিনে রামবাবুর বড় ছেলে আসিয়া পৌঁছিল। সেদিন ভববিভূতি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। পরদিন জ্বরের বেগ কমিয়া আসিল, বিকারটাও কাটিয়া গেল। ভববিভূতি বলিল, "এখন খুব সাবধান থাকা দরকার; এই ভাব যদি চলে, তবে আর চিন্তা নাই।"

পঞ্চম দিনে জ্বর ত্যাগ হইল, কিন্তু তারপর আবার অল্প জ্বর হইয়া আরও সাতদিন ভোগের পর নয়নতারা নিরাময় হইলেন।

তাঁর অসুখের সময় এই সুন্দর ছেলেটির শুশ্রূষায় একাগ্র নিষ্ঠা দেখিয়া নয়নতারা মনের ভিতর কত কথার তোলাপাড়া করিলেন। ভাবিলেন, এমন স্বামীর হাতে পড়া রমার সৌভাগ্য। আবার তখনি মনে হইল "দ্বিতীয়

পক্ষ"; মনে হইল তাঁর নিজের বঞ্চিত যৌবনের কথা। শেষে মনে স্থির করিলেন, ইহারই হাতে রমাকে তুলিয়া দিবেন। ভাবিতে মন আবার কালিতে ভরিয়া উঠিল।

হিসাবী রামবাবু তখন ভাবিতে লাগিলেন, ভববিভূতির প্রণামীর কথা; শঙ্কা হইল যে, বুঝি বা ডাক্তার বিদায় করিতে তাঁহার পাঁজরের হাড় বিক্রী হয়। ৫০০৲ টাকার নোট পকেটে করিয়া তিনি ভববিভূতির বাড়ী গেলেন; স্থির করিলেন, সামনা-সামনি দেওয়াই ভাল, বেশী কিছু চাহিতে চক্ষুলজ্জায় ঠেকিবে।

২০০৲ টাকার নোট হাতে করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি যা ক'রেছেন, তার দাম দি, এমন শক্তি আমার নেই। যদি অনুগ্রহ ক'রে এই ক'টা টাকা নেন, তো কৃতার্থ—"

ভববিভূতি হাসিয়া বুড়ার হাত চাপিয়া বলিলেন, "আরে রাম! বলেন কি রামবাবু!" নোটের তাড়া তৎক্ষণাৎ পকেটে গুঁজিয়া সে প্রসঙ্গও তুলিল না, রোগিণীর বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। রামবাবু নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করিলেন; একবার মনে হইল বাকী ৩০০৲ টাকার নোট ডাক্তারের পায় ফেলিয়া দিয়া তাহাকে প্রণাম করেন। লজ্জায় বাধিল; তাহা আর পারিলেন না। ঘরে ফিরিয়া কেবলি ভাবিতে

লাগিলেন, "বেকুব, গণ্ডমূর্খ আমি, মানুষ চিনিতে পারি নাই।"

কিছুদিন পরে ভববিভূতির মা ও বড় ভাই ভবরঞ্জন আসিয়া পৌঁছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া অবশেষে রামবাবু ভবরঞ্জনের কাছে বিবাহের কথা পুনরুত্থাপন করাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার মেয়ে বড়, সাজিয়ে গুজিয়ে দেখাতে আমি ইচ্ছা করিনা, তবে তাঁরা যখন খুসী এসে তাকে দেখে যাবেন—শুধু মেয়ে যেন টের না পায়।"

একদিন ভবরঞ্জনের মা মেয়ে দেখিয়া গেলেন, ভবরঞ্জন আর একদিন আসিয়া রমার সঙ্গে আলাপ করিয়া গেলেন। আট দশ দিন পরে ভবরঞ্জন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, বিবাহের কথা কিছু বলিয়া গেলেন না।

৪

কয়েকদিন চলিয়া গেলে রামবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ভববিভূতির হাতে কন্যাদান করাটা তিনি স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন,—আর এটা মেয়ের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছিলেন। তাঁর মেয়েকে যে ভববিভূতি বিবাহ করিতে পাইলে আনন্দিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যখন ভবরঞ্জন মেয়ে দেখিয়া বেশ খুসী হইয়া তার সঙ্গে গল্পসল্প করিয়া গেলেন, তখন তিনি কেবল মনে মনে বিবাহের খরচের হিসাব করিতে লাগিলেন; কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করিবেন; কোন্ কোন্ কুটুম্ব আনাইবেন; কি রকম ঘটা করিবেন; এই সব ভাবিতে লাগিলেন। ঘটা করিবার বেশ একটু ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন মনে হইল যে ভববিভূতির দ্বিতীয় পক্ষ, সে হয় তো বেশী ঘটা করিলে লজ্জা পাইবে; কথাটায় তাঁরও মনে একটু ক্লেশ হইল।

কিন্তু যখন দশ বারো দিন চলিয়া গেল, আর যখন ভবরঞ্জন কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন, তখন রামবাবু মহাগোলে পড়িলেন, বেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তবে কি এ বিবাহ হইবে না?

নয়নতারা মনে-মনে সম্পূর্ণ উল্টা দুই রকমের চিন্তা

লইয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। মেয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌভাগ্যের কথা যখন মনের ভিতর আনন্দের ঢেউ তুলিয়া আসে, তখনি আবার উল্টা দিক্ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা তাকে ধাক্কা দিয়া সমান করিয়া দেয়; এই রকম আলো-ছায়ার ঢেউয়ে তাঁর মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, এ কয়দিন সেই চিন্তা ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবেন নাই।

নয়নতারা কুটনা কুটিতেছে, মেয়ে উপরে পড়িবার ঘরে পড়িতেছে, এমন সময় রামবাবু আসিয়া একটা মোড়া টানিয়া গিন্নীর সামনে বসিলেন। বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওগো, ভবরঞ্জন তো চলে গেল কলকাতায়, কিছু ব'লে তো গেল না।"

গিন্নী একটা আলু দ্বিখণ্ডিত করিতেছিলেন। দুই খণ্ড দুই হাতে ধরিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "চলে গেল? কিছু ব'লে গেল না? কি অভদ্র!"

স্বামী-স্ত্রী কেহ যে সম্ভাবনাটার কল্পনাও করেন নাই, ও পক্ষ হইতে বিবাহে অমতের সেই সম্ভাবনাটা নয়নতারাকে এই প্রথম আঘাত করিল। এতক্ষণ তিনি যে মত এবং অমতের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দোল খাইতেছিলেন, এর ধাক্কায় তাঁহাকে ঠেলিয়া সেই স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে এ বিষয়ে সম্মতির ভিতর ফেলিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে বড় অভিমান হইল।

রামবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "অভদ্র কিসে বলি, হয় তো চক্ষুলজ্জা। জান তো ওরা কি ভালমানুষ!"

"কিন্তু এটা ওরা অবশ্য জানে যে, এতে আমাদের কত বড় অপমান করা হ'বে।" "দেখ গিন্নী, আমাদের ঘা' খেয়ে মনে হচ্ছে তাই, কিন্তু তোমার ছেলের বিয়ের কথায় তুমিও তো কত লোকের মেয়ে দেখেছ, কারু সঙ্গে তো এখনো শচীর বিয়ে হয় নি! দশটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিতে হ'লে ন'টাকে তো নাপছন্দ ক'রতেই হ'বে।"

"কিন্তু নাপছন্দ করে কি বলে? হাজার হ'লেও দোজবরে ছেলে; তা'র সঙ্গে আমার এ চাঁদের মত মেয়ে, লেখাপড়ায়, কাজ-কর্ম্মে এমন মেয়ে দিচ্ছি এই ঢের। এ যে বাপু তা'দের আশ্চর্য্য দেমাক্।"

"দেমাক্ কি বল? দশটা দেখে যেটা পছন্দ হ'বে সেইটি নেবে। এর ভিতর দেমাক্ আসে না। আর, হ'ক দোজবরে, তবু আমরা যে আগ্রহ ক'রে দিতে যাচ্ছি এতেই তো বোঝা যাচ্ছে যে ছেলের গুণ তার দোজবরে' দোষকে ঢের ছাপিয়ে উঠেছে।"

"তাতো বটেই—তা নইলে এ কথা তোলেই বা কে? কিন্তু তবুও বলি, এতটা করা ভাল হয় নি। তোমার বুদ্ধিতেই তো এই নাহক অপমানটা হ'ল। তুমি যেন একেবারে ক্ষেপেই গেলে এই ছেলে ব'লে!"

রামবাবু হাসিলেন, "ক্ষেপেছিলুম তো আমি একা নয়

ক্ষেপী?" "নিশ্চয়; আমি তো বরাবরই ব'লেছি, একটু ভাল ক'রে ভেবেচিন্তে দেখ; থপ ক'রে কথাটা তুলে শেষে পস্তাতে না হয়।" অনেকখানি সত্য। দোলায়মানচিত্তে নয়নতারা যখন স্বামীকে বিবাহের প্রস্তাব করিবার কথায় মত দিয়াছিলেন, তখন তাঁর মনে এই রকম হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, তিনি মুখ ফুটিয়া এ সন্দেহের কথা কখনো বলিয়াছিলেন।

রামবাবু বলিলেন, "যা'ক, সে সব কথা তুলে আর কি হ'বে। যা' হ'বার হ'য়েছে। কিন্তু ওদের মনের কথাটা কি একবার জানা দরকার নয়? তারা যে একেবারে অপছন্দই ক'রেছে, তা'রই বা নিশ্চয়তা কি? হয় তো বা আরও মেয়ে দেখতে বাকী আছে; সে সব না দেখে একটা কোনও কথা ব'লতে চায় না।"

"তোমার মাথা আর মুণ্ডু! এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ মেয়েতে তাদের মন নেই। না হ'লে তবু হাতে রাখবার মত একটা কথা তো ব'লে যেতে পারতো।"

রামবাবুর মনে পড়িল, ভবরঞ্জন তার এক জেঠামহাশয়ের কথা একবার তুলিয়াছিল, বলিলেন "হয় তো বা তার জেঠামহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মতামত জানাবে।" নয়নতারা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হবে।" বলিয়া মুলতবী আলু-কাটা শেষ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রামবাবু বলিলেন, "আমি বলি,

তুমি একবার ওর মার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মনটা বোঝ।"

নয়নতারা বলিলেন, "আমি বাবু, আমার মেয়ে নিয়ে অমন ফিরি ক'রে বেড়াতে পারবো না। আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হ'বে তাতে তো ওর জীবনটা মিথ্যে হ'য়ে যাবে না। পড়ছে পড়ুক, ওই নিয়েই থাক।"

রামবাবুর মনের ভিতর সেকেলে ভাব ছিল, কিন্তু তিনি সে কথাটা বরাবরই চাপিয়া আসিয়াছিলেন, পাছে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে কোনও মতে প্রাচীন সাব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাই অশন-বসন, ধরণ-ধারণ তাঁর সম্পূর্ণ আধুনিক; কিন্তু মেয়ে যে চিরকাল আইবড় থাকিবে, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে কিছুতেই ভাল লাগিল না। অনেক কথাবার্ত্তার পর সাব্যস্ত হইল যে, আজ দুপুর বেলায় নয়নতারা ডাক্তারের বাড়ী যাইবেন।

কিন্তু স্বামীকে কাছারীতে বিদায় করিয়া দিয়া স্নানাহার শেষ করিতে-করিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল; তার পর তিনি সবে একখানা কৌচের উপর শুইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় মজুমদার-গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"মেঘ না চাইতেই জল" দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি একগাল হাসিয়া প্রতিবেশিনীকে সম্ভাষণ করিলেন।

ভববিভূতির মা অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প-সল্প করিলেন,

কিন্তু আসল কথা কিছুই হইল না। নয়নতারারও জিজ্ঞাসা করিতে কিম্বা খুব পরোক্ষভাবেও কথাটা পাড়িতে বড় লজ্জা হইল। জগদম্বা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে নয়নতারা তাঁর কথাগুলি লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিলেন। কয়েকটি কথা লইয়া তাঁহার যুক্তি-তর্কের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

প্রথম কথা, গিন্নী বলিয়াছিলেন যে, ছেলে তাঁকে রোজ রোজ এ বাড়ীতে এসে নয়নতারার সঙ্গে আলাপ করিতে বলে। ইহা ভববিভূতির এ বিবাহে আগ্রহের পরিচায়ক।

দ্বিতীয় কথা, ভববিভূতির জননী মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা অকর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের এ বিবাহে আপত্তির সূচক।

তৃতীয় কথা, বিবাহে দেওয়া-থোয়ার কথা সম্বন্ধে গৃহিণীর মত এই যে, টাকার ওজনে আজকাল যে মেয়ের বিয়ে হয়, সেটা ভয়ানক অসঙ্গত; মেয়েটাই হ'ল আসল জিনিস, অথচ সেইটাই লোকে ভাল ক'রে দেখা ভুলে গেছে।

চতুর্থ কথা, মেয়েদের সুলক্ষণ-অলক্ষণের কথা; এই উপলক্ষে মেয়েদের বুট-পায়ে ঘট্ ঘট্ করিয়া মেম-সাহেবের মত লাফাইয়া চলার নিন্দা হইয়াছিল।

পঞ্চম কথা, ভববিভূতির প্রথমা স্ত্রীর রান্নার সুখ্যাতি।

ষষ্ঠ কথা, ছেলের সুখ্যাতি। সে তার মায়ের কথায় ওঠে-বসে।

এ কথাগুলি নয়নতারা একসঙ্গে করিয়া তার ভিতর হইতে অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জগদম্বা যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাতে যে এগুলির এ রকম কোন অর্থ থাকিবেই, নিরপেক্ষ লোকে এ কথা হলপ করিয়া বলিতে পারে না। কথাগুলি একসঙ্গে বলা হয় নাই, এক-এক কথার প্রসঙ্গক্রমে এক-এক কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। নয়নতারা কিন্তু সাব্যস্ত করিলেন, ভব-বিভূতির এ বিবাহে সম্মতি আছে, কিন্তু গৃহিণীর অসম্মতি। মাতৃভক্ত পুত্র মায়ের কথাই মানিবে।

স্বামী ফিরিয়া আসিলে আবার এ কথা লইয়া আলোচনা হইল, কিন্তু কিছুই স্থির হইল না।

৫

ঘরে ফিরিয়া জগদম্বা দেখিলেন ভববিভূতি বাড়ীতে আসিয়াছে, তা'র মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। সে একটা মুমূর্ষু রোগিণীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল, সে মারা গিয়াছে।

জগদম্বা বলিলেন, "কি বাবা, কি হ'ল।" "মারা গেছে। আমি বরাবরই জানি মেয়েটা বাঁচবে না, তবু শেষের দিকে বড্ড আশা হ'য়েছিল।" বলিয়া ভববিভূতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জগদম্বা বলিলেন, "হাঁ রে, তুই হলি ডাক্তার তোর কি রুগীর ভালমন্দে অতটা মন খারাপ ক'রলে চলে?"

"কি ক'রবো মা? আমি তো পয়সা ক'রবো ব'লে ডাক্তার হইনি; লোকের রোগ-শোক দেখে একেবারে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে না থেকে কিছু উপকার ক'রতে পারবো, সেই আশায় ডাক্তারী শিখেছি। আর সে বাড়ীর অবস্থা দেখে কার না কান্না পায়। ছেলেমানুষ মেয়েটি, তার স্বামী কলেজে পড়ে, তার একটি ছোট ছেলে আছে। মেয়েটা মরে' গেল, তা'র স্বামী ছেলেটাকে বুকে ক'রে যে রকমে ছট্‌ফটাতে লাগলো, দেখে ভারি কষ্ট হ'ল। আহা বেচারা কতবার জিজ্ঞাসা করেছে 'ডাক্তারবাবু, বাঁচবে কি?' কত আশা ক'রে আমার কাছে বারবার ঘুরেছে,

অথচ আমি বরাবর জানি যে কিছুই ক'রতে পারবো না।" ডাক্তারের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

জগদম্বা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ভগবানের হাত বাবা, তুমি কি ক'রবে। চল এখন খাবার খাবে চল।"

ভববিভূতি নীরবে খাইতে খাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "অথচ দেখ, দু'দিন বাদেই হয় তো ওই ছেলেটা বিয়ে করে বসবে।"

মায়ের প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তিনি সে প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

দুইদিন পরে মাতা ছেলের কাছে কথা তুলিলেন, "বাবা, রঞ্জন লিখেছে, সুশীল ভট্টচাযের মেয়েটি পরমা সুন্দরী, আর খুব সুলক্ষণা; বল তো সেখানেই কথা দিই।"

ভববিভূতি একখানা বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল "না, মা, আমি বিয়ে ক'রবো না, সেই ঠিক।"

"বিয়ে করবি নে কি রে? তোর বয়সে কি চিরদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকা শোভা পায়?"

ভববিভূতি হাসিয়া বলিল, "সন্ন্যাসীর কি সাজটা দেখ্‌লে মা? আমার মত বাবুয়ানী ঢাকা সহরে ক'টা লোকে করে?"

"ওর মানেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কি সাজ করে, সন্ন্যাসী

হয় মনে। বাড়ী ঘর দোর খাঁ খাঁ ক'রছে ; একটা ছেলেপিলের আওয়াজ নাই, ঘরের লক্ষ্মী নাই, আমি তো বাছা, এ আর চোখে দেখতে পারি না।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম মা! আমি বলি রেণুকে এবারে নিয়ে আসি। মেয়ে তো তিন বছরে পা দিয়েছে, আর সেখানে রাখ্‌বার কি দরকার।"

"তা আনবি বই কি? কিন্তু সেই একফোঁটা মেয়ে হলেই কি ঘরের ছিরি ফেরে? এমন পাগ্‌লামী করিস নে বাবা, আমার কথা রাখ, বিয়ে কর। সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ে ঘরে এলে তোর ঘর আলো হ'য়ে যাবে।"

এই সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ের নামটা যেন কেবলই ভব-বিভূতির মনে কশাঘাত করিতেছিল। সে বলিল, "ঘর তো একবার আলো হ'য়েছিল মা, ভগবানের সইল না। আবার কেন? অদৃষ্ট কি তোমার কথায় ফিরবে মা?"

জগদম্বা আকাশ হইতে পড়িলেন। আজ এক বৎসর যাবৎ তিনি ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। ছেলের মত যদিচ কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই, তবু তার যে বিবাহে এমন একটা প্রচণ্ড আপত্তি আছে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তবু তিনি হাল ছাড়িবার পাত্র নন ; তিনি বলিলেন, "সে কি কথা, বাবা একবার ঘর পুড়ে গেলে আর কি ঘর হয় না। এমন তো লোকের রোজ হচ্ছে। এই তো পাশের বাড়ীতেই দেখ না ;

রামবাবু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হ'য়ে না হ'য়েছে কি? তাঁর সংসার দেখলে চক্ষু জুড়ায়,—এমন সুখ-শান্তির সংসার, এমন স্ত্রী, এমন ছেলে, এমন মেয়ে সাত জন্মের পুণ্যের ফল।"

ভববিভূতি বেশ একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া কথাটা শুনিয়া গেল। কথাটা শেষ হইতেই সে যেন একটু হতাশ হইয়া মুখ ফিরাইল। মা অতটা লক্ষ্য করিলেন না।

একটু হাসিয়া ভববিভূতি বলিল, "তা, ঠিক মা, রাম-বাবুর বাড়ী দেখলে বিয়ে ক'রতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যেটায় লোভ হয়, সেইটাই যে ক'রতে হ'বে তা'র কোনও মানে নেই।" ভববিভূতি বোধ হয় সরলভাবেই কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু বলিয়া মনে হইল এ কথার একটা দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে। মাতা বলিলেন, "শোন ছেলের কথা! বিয়ে ক'রতে লোভ হয় যদি তবে বিয়ে করবি না কেন?"

"বিয়ে ক'রতে যেমন লোভ হয় তেমনি আরও দশটা ভাল মন্দ কাজ ক'রতেও তো লোভ হয়। আমার লোভটা বেশী প'ড়েছে অন্যদিকে,—তা'তে এত কাজ আর এত দায় যে, একটা সংসার হ'লে আমি তা' কিছুতেই পেরে উঠবো না। বিয়ের স্বাদ তো একবার পাওয়া গেছে; এখন, এই নূতন জিনিসটা একবার পরখ করে দেখবো, স্থির ক'রেছি!"

মাতা একটু শঙ্কিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সে কাজ ?"

"কাজটা প্রকাণ্ড, কিন্তু আমার শক্তি ছোট ; তাই সে কথা মুখ ফুটে কাউকে বলি না। সমস্ত জীবন সেই কাজে সমর্পণ করে যদি কিছু একটু সার্থকতা লাভ করি, তবেই ব'লতে পারবো লোককে। তবে এক কথায় ব'লতে পারি যে, কাজটা দীন-দুঃখীর সেবা।"

"সে কি আর বিয়ে ক'রলে হয় না ? তোর বাপ যত দীনদরিদ্রের সেবা ক'রেছেন, তেমন ক'টা লোক ক'রতে পারে ?"

"তিনি ক'রেছেন ঠিক, কিন্তু যদি তোমার আমার চিন্তা তাঁর না থাকতো, তবে তিনি আরও কত বেশী কাজ ক'রতে পারতেন। তাঁর যতটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার সিকির সিকিও তিনি ক'রতে পারেন নি। যদি তিনি নিজেকে নিঃশেষভাবে দীন-দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত ক'রতে পারতেন, তবে তিনি জীবনটাকে কত বেশী সার্থক মনে ক'রতে পারতেন, সে কথা তিনি নিজেই তো কতবার ব'লেছেন। তুমি কি জান না মা, জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে বাবা কত দিন কত ভাবে দুঃখ ক'রেছেন।"

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীর এ আত্ম-গ্লানির কথা তাঁর অজানা ছিল না। জগদম্বা নিজে কতদিন তাহাতে রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়া

বলিয়াছেন, "আমিই তো তোমার সকল পথের কাঁটা, আমি ম'লেই দুঃখ যায়।" তাহাতে স্বামী কত ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন—সে কথা ভাবিতে বিধবার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি বাবা, অতশত বুঝি না। সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ে পছন্দ না হয়, তো যা'কে তোর পছন্দ হয়, একটা বিয়ে কর। বৌ আমায় দিয়ে তুই নিজে যা খুসী কর্।"

ভববিভূতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "মা, আমি কি তোমার সঙ্গে তামাসা করছি? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলছি? সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ে পছন্দ হয় নি, তাই অন্য কথা বলে শুধু ভাঁড়াচ্ছি, এ কথা তুমি কি ব'লে মনে করলে?"

৬

ইহার দু'একদিন পরে সন্ধ্যাবেলার মজলিসে দু'-এক কথার পরই অমৃত বলিয়া বসিল, "হাঁ হে বিভূতি, তুমি না কি বিয়ে ক'রতে চাও না ?"

ভববিভূতি সন্দিগ্ধচিত্তে তাহার দিকে চাহিল ; তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এরা মায়ের চর।

যোগেশ বলিল, "এ বিষয়ে আমাদের সংবাদপত্রের মতে Great dissatisfaction prevails" 'আমাদের চা টা' গৃহলক্ষ্মীর হস্তস্পর্শ না থাকায় যেন কেমন লক্ষ্মীছাড়া মত খেতে লাগে। Ergo, তোমার বিয়ে করা আমাদের Unanimous resolution. যাঁহারা এ প্রস্তাবের সপক্ষে, তাঁহারা হাত তুলুন ! All, All ! বন্দেমাতরম্। Carried unanimously." বলিয়া যোগেশ একাই সভার সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া করতালি-ধ্বনি করিল। অমৃত বলিল, "তামাসা নয়, আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে বিচার করিতে চাই। তোমার কি বল্‌বার আছে বল।"

ভববিভূতি শান্তভাবে বলিল, "তুমিই না সে দিন ব'লছিলে যে, একজনকে ভালবাস্‌লে তার পর আর একজনকে ভালবাসা অসম্ভব। আমি আমার স্ত্রীকে সত্যসত্যই ভালবাসতাম !"

যোগেশ বলিল, "সেই জন্যই তোমার বিয়ে করা দরকার; বিজ্ঞানের খাতিরে, Experimentএর জন্য। যদি তুমি বিয়ে ক'রে তোমার দ্বিতীয় পক্ষকে ভালবাস, তবেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তোমার কথাই ঠিক, Man is a polygamous animal"

ভব। সে প্রমাণ আমি বিয়ে না ক'রলেই যে হ'বে না, তার কি মানে আছে। লক্ষ-লক্ষ লোক যে রোজ বিয়ে ক'রে দ্বিতীয়ার প্রেমে মসগুল হ'য়ে যাচ্ছে, তাতেই তো সে কথা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বেলাই যে এই ব্যাপার—স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর অপেক্ষা রাখে না, তা'রও তো ঢের প্রমাণ র'য়ে গেছে। Divorce Courtএর নথি দেখলে এমন লক্ষ লক্ষ নজীর পাওয়া যাবে।"

অমৃত বলিল, "তাই যদি হয়, তবে তোমার বিয়ে ক'রতে আপত্তি কি?"

ভব। বাঃ, আমিও তো তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি যে, তোমরাই বা বিয়ে ক'রবে না কেন? এই ধর না অমৃত, তোমার গৃহিণীর তো এখন তিরিশের কাছাকাছি বয়স; তিনি ছেলে-পিলে নিয়ে বিব্রত, তোমার প্রেমের পরিতৃপ্তি সাধন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তুমি কেন না বিয়ে ক'রবে?

যোগেশ। আমাকে যদি বল, তবে আমি বলি,

Barckis is willing, কিন্তু শতমুখীর ভয় এবং দুই স্ত্রী পালন করবার অক্ষমতাই আমার একমাত্র বাধা।

অমৃত। একমাত্র নয়, দুইমাত্র বল।

যোগেশ। তাই হ'ল।

ভব। আর একটা "তিন মাত্র" আছে,—লোক-মতের শাসন। সেটা বড় তুচ্ছ কথা নয়।

যোগেশ। ঠাট্টা apart, তোমার বেলায় সে বাধা নেই। তা ছাড়া, দ্বিতীয় বিবাহে কতকগুলা গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং মোটের উপর সুখ হয় না; তোমার সে ঝঞ্ঝাট নাই।

ভব। বিবাহের বিরুদ্ধে যদি কেবল এই দুইটি আপত্তিই থাকে, তবে তা অন্য লোকের বেলায় খণ্ডন করা অসম্ভব নয়। বেশীর ভাগ লোকের বিয়ের ১৫।২০ বছর পর আর প্রেম থাকে না, বরঞ্চ অনেকটা বিরাগের ভাবই এসে পড়ে। আর মনটাও অপরের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং আইন অনুসারে যদি এ অবস্থায় পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—তবেই ত লেঠা চুকে যায়। সংসারে ঝঞ্ঝাটও থাকে না, লোকমতও তৈয়ার হ'তে বেশী দিন লাগে না।

যোগেশ বলিল, "তার পর ছেলেপিলেগুলোর কি উপায় হ'বে?"

ভব। সে ভাববার কথা। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা

দিয়ে তারও একটা বন্দোবস্ত করা যায়। এই ধর, যদি ছেলেপিলের ভার ষ্টেট গ্রহণ করে এবং ষ্টেটের নার্সরি, স্কুল, কারখানা প্রভৃতি থাকে, যেমন সোস্যালিষ্টদের কেউ কেউ বলে।

অমূল্য। সে রকম ভাবে একটা সমাজ চলতেই পারে না। Communismএর বিরুদ্ধে আরিষ্টট্লের যুক্তি এ পর্য্যন্ত খণ্ডন হয় নি।

ভব। অনেকটা হয়েছে বৈ কি? আরিষ্টট্লের আমলে মানুষের পরসেবার শক্তি এবং সমবেত কার্য্যের শক্তি যতটা ছিল, এখন তার চেয়ে অনেকটা বেড়ে গেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

যোগেশ। তুমি এ থেকে বলতে চাও কি?

ভব। আমি ব'লতে চাই এই যে, কেবল প্রবৃত্তির দিক্ থেকে দেখতে গেলে, এ সব যুক্তির কোনও উত্তর নেই। পৃথিবীর পরিণতির ইতিহাসের হিসাবে দেখতে গেলে সে বড় বেশী দিন নয়, যখন মানুষের পূর্ব্বপুরুষ পশু ছিল। মানুষের সমাজের ইতিহাসে এই তো সেদিন নারী ছিল প্রবৃত্তির দাসী। এই তো সবে আমরা আরম্ভ ক'রেছি প্রবৃত্তিকে লাগাম পরিয়ে একটা সমাজ গড়ে তুলতে। আজও সে পশু-পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত আমাদের ভিতর বেশ গরম আছে। আমাদের যৌন-নির্ব্বাচনটা হয় প্রধানতঃ সেই পশুর রক্তের জোরে। কিন্তু সমাজের

অষ্ট বন্ধনে তার উদ্দাম ভাবটাকে আটকে রাখা হয়। সেই রক্ত প্রায়ই ছুটে বেরিয়ে পড়ে, আর সব বন্ধন ভেঙ্গেচুরে দেয়। প্রবৃত্তি হিসাবে আমরা কখনই monogamous হ'তে পারি না। কিন্তু সমগ্র evolutionএর ফলে দেখা গেছে যে, এই যে প্রবৃত্তিমার্গ, এতে সুখ নেই, কেন না এর পরিতৃপ্তি নেই। চিরস্থায়ী বিবাহ বন্দোবস্তে আপত্তি হচ্চে এই যে, এতে ধরে-বেঁধে পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে রাখে, যখন তাদের পরস্পরের আকর্ষণ মোটেই থাকে না। কিন্তু তা' যদি না রাখে, কেবল আকর্ষণটাই যদি যৌন-সম্বন্ধের একমাত্র নিয়ামক হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের একেবারে অবাধ promiscuityতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তা'র চেয়ে কম কিছুতেই প্রবৃত্তির এ দুঃখ দূর হবে না। অথচ, আমরা যে যাই বলি না কেন, এই যে বিবাহের স্থায়ী বন্ধন, এর ফলে খুব বেশী লোক যে খুব বেশী কষ্ট বোধ করছে তা নয়। এ বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্চে এই যে "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

যোগেশ। এ কথা ষোল আনা মেনে নিলেও স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর পর অপরের বিবাহে কোনও আপত্তি চলে না।

ভব। সে স্থলে আপত্তিটা কম প্রবল হ'লেও নেহাত কম নয়। এ রকম বিয়েও তো প্রবৃত্তিরই ফল। এ প্রবৃত্তিটা যত দমন ক'রে রাখা যায়, ততই ভাল।

অমৃত। তোমার মতে তবে ভালবাসাটা কিছু নয়? কেবল একটা শারীর প্রবৃত্তি?

ভব। সে কথা এখানে ওঠে না। ভালবাসাটাকে আমি বেশ ভাল জিনিস ব'লেই মনে করি। সেটা হ'চ্ছে নিয়ত প্রবৃত্তি। সমাজের অভিজ্ঞতা যে গণ্ডীতে প্রবৃত্তিকে আবদ্ধ ক'রেছে, তার ভিতর প্রবৃত্তিটা ভালই ব'লতে হবে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ ভাই, বিয়ে জিনিসটা কেবল ভালবাসাবাসির ব্যাপার নয়। দুইটা জীবন যখন নিরত সংঘর্ষে আসে, তখন তাদের ভিতর যে বন্ধনটা তৈয়ারী হয়, সেটা কেবল ভালবাসার বন্ধন নয়। সেটা একটা প্রকাণ্ড complex ব্যাপার। একটা মানুষের জীবন যত জটিল, এ সম্বন্ধ তার চেয়ে ঢের বেশী জটিল। কারণ, এ দুইটা জীবনের যতগুলি বহির্মুখী শক্তি আছে, সবার পরস্পর মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সংসারে স্বামী-স্ত্রী কেবল প্রেমিকা নয়—তাদের সমস্ত জীবন পরস্পরের সঙ্গে এক হ'য়ে একটা প্রকাণ্ড জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি করে, শুধু ভালবাসাবাসির ওজনে তা'র ভাঙ্গাগড়া চলে না।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! ভববিভূতি অন্তরের সহিত সমস্ত কথা বলিতেছিল: যে কথা সে বলিতেছিল, সেই গুলি তাহার মনের ভিতর গিয়া আবার একটা নিভৃত চিন্তাস্রোতের সৃষ্টি করিতেছিল। প্রত্যেকটি কথা বলবার

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের মধ্যে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক, বিচার চলিতেছিল। আবার এই যে নিভৃত চিন্তাস্রোত, তাহারও নীচে আর একটি স্রোত বহিতেছিল; তাহার প্রতি ক্ষুদ্র তরঙ্গে একটি ছোট অশ্রুভরা মুখ প্রতিফলিত ছিল। সেটি অশ্রুমুখী, সেবানিরতা রমার। সে দিন ভববিভূতি নয়নতারার ঘরে গিয়া প্রাণের ভিতর যে প্রথম ধাক্কাটা খাইয়াছিল, তাহা বিষাক্ত বীজাণুর ন্যায় প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহার মনোময় জীবনের নানা ধারার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে বীজ বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ সমান তীব্র-ভাবে চলিতেছিল।

* * * * *

কয়েক দিন বাদে রামবাবু ভবরঞ্জনের কাছে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, ছেলের বিবাহ করিতে মোটেই মত নাই; তাই ভবরঞ্জন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই। রামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; নয়নতারা রাগিল; কিন্তু সকলেই স্থির করিয়া বসিল যে, এ বিবাহ হইল না।

৭

ভববিভূতি রেণুকে লইয়া আসিল। রেণু খাসা মেয়েটি। মোটাসোটা, গোলগাল, একেবারে যেন মেলিন্স ফুডের একখানা ছবি। তার জন্য একটা আয়া ছিল, সে প্রায়ই রামবাবুর বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যাইত।

রমার এই মেয়েটাকে দেখিলে কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। হাতের সব কাজ ফেলিয়া এই মেয়েটিকে কোলে করিয়া তাহার বেড়ান চা-ই চাই। আর দিনরাত সেই মেয়ের কথা, তার ভাবভঙ্গী, কার্য্যকলাপের আলোচনা। আয়া দেখিল, এখানে আসিলে তা'র পরিশ্রমের লাঘব হয়; কাজেই দুবেলা খুব বেশী সময় রেণু রামবাবুর বাড়ীতে রমার কাছেই কাটাইত।

রেণুর কি খেয়াল হইল, সে প্রথম হইতেই নয়নতারাকে "দিনিমা" (দিদিমা) বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল এবং তাঁহার কোল জুড়িয়া বসিল। নয়নতারা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, কিন্তু বালিকাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

এখন রেণুকে বাড়ীতে রাখা ভার। সে সর্ব্বদাই "ওম্মা" (রমা) ও দিদিমার কাছে যাইবার জন্য অস্থির।

রমাও এই মাতৃহীনা কন্যাটির জন্য অসীম স্নেহ লইয়া তাহার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত।

পরীক্ষার পূর্ব্বে স্কুলের ছুটি হইলে সে রোজ তার মাকে টানিয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ী লইয়া যাইত, এবং সেখানে রেণুকে কোলে করিয়া তাহার সঙ্গে খেলিতে-খেলিতে পরীক্ষার পড়া করিত। শেষে নয়নতারা না গেলেও সে নিজে রোজ যাইত।

একদিন দুপুর-বেলায় রমা উঠানে রোদে বসিয়া চুল শুকাইতেছে, আর বই পড়িতেছে, রেণু তার চারপাশে ফিরিয়া ধূলা ও মাটি লইয়া খেলা করিতেছে। মাঝে-মাঝে ছুটিয়া গিয়া রমার চিবুক ধরিয়া কত সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করিতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া এমন ইঙ্গিত দিতেছে যে, তাহার ইচ্ছামত উত্তর দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। রমা বইয়ের ভিতর ডুবিয়া আছে; তবু রেণু যখনি কাছে আসিতেছে, তখনই হাসিমুখে দু-হাতে তার মুখখানা ধরিয়া কথা কহিতেছে।

দাওয়ার উপর আয়া বসিয়া হাই তুলিতেছে। জগদম্বা আঁচল বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় ভব-বিভূতি বাড়ী ফিরিলেন। সম্মুখে ধ্যানমগ্না ষোড়শীর মূর্ত্তি দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন! রমা গৌরাঙ্গী নহে, কিন্তু তাহার রংটি বড় মিঠে; আর, সমস্ত শরীর অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত; সমস্ত মুখ ও চক্ষু আয়ত প্রতিভার

আলোকে উজ্জ্বল। তাহার বেশভূষার মধ্যে এমন একটা সহজ সৌন্দর্য্য ছিল এবং তাহা তাহাকে এমন সুন্দর মানাইত যে, অত্যন্ত সামান্য পরিচ্ছদেও তাহাকে খুব সুসজ্জিত মনে হইত। তাই, সে যখন একটা ছোট মোড়ায় বসিয়া হাঁটুর উপর বই রাখিয়া, গালে হাত দিয়া উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল, এবং তাহার ঘন চিক্কণ কেশদাম সমস্ত পিঠ ছাইয়া পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার মূর্ত্তিটি যে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিবার যোগ্য হইয়াছিল, এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। ভববিভূতি একবার স্থিরদৃষ্টে চাহিলেন। পরমুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইলে তাঁহার হৃদয় অন্ধকার হইয়া উঠিল।

এমন সময় রেণু ডাকিল "ওম্মা"! ডাক শুনিয়া ভববিভূতি চমকিয়া উঠিলেন। এ ডাকের মধ্যে ওকারটা চাপা থাকে, জোর পড়ে "ম্মা"র উপর; তাই ভববিভূতি চমকিত হইলেন। চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, রেণু রমার পাশে দাঁড়াইয়া এক হাতে এক গোছা চুল ধরিয়াছে, আর এক হাতে চিবুক ধরিয়া মহা গম্ভীর ভাবে, খুব ঘাড় নাড়িয়া, চোক দুটো বড়-বড় করিয়া কি একটা কথা বলিতেছে। রমা হাস্য প্রফুল্ল মুখ ও উৎফুল্ল লোচন তাহার মুখের দিকে ফিরাইয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া সব কথায় সম্মতি দিতেছে। কথা বলা শেষ হইয়া গেলে রমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, দুই হাতে রেণুর সেই

মোটা-মোটা গাল দুটা চাপিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। ভববিভূতি বুঝিল যে, রমা তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া রেণুর মাতৃত্ব পদবী অনায়াসে অধিকার করিয়াছে। কথাটা ভাবিতে তাহার মনের ভিতর একটা ধাক্কা লাগিল,-- সেটা আনন্দের না দুঃখের, ঠিক বুঝা গেল না।

ভববিভূতি ডাকিলেন, "রেণু।" সমস্ত উঠানটায় বিদ্যুতের মত যেন একটা চমক খেলিয়া গেল আয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসন সংবৃত করিল। রেণু তাহার বড় বড় চোখ দুটা ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। রমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কি জানি কেন কাঁপিয়া উঠিল; সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। জগদম্বার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "এলি বাবা? এত বেলা হ'ল?"

"হাঁসপাতাল হ'তে ফিরবার সময় আজ ৮টা রুগী দেখতে হ'য়েছে" বলিয়া ভববিভূতি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া আয়াকে দিল, মাকে দিবার জন্য; এবং নিজে রেণুর দিকে অগ্রসর হইল। রেণু ধূলামাখা হাত লইয়াই বাপের কোলে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রমা, তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ধূলা ঝাড়িয়া দিল। ভববিভূতি কন্যাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

বাপের আদর পাওয়া হইয়া গেলে রেণু তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। বাবা বলিল, "কেন রে, কোথা যাবি?"

"ওম্মা আগ কোন্দে" বলিয়া নামিয়া আসিয়া রমার কোলে উঠিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমা ভাল বাছি।" রমা তাহার মুখচুম্বন করিল। রেণু আবার বাপের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমা ভাল বাছি, ওম্মা ভাল বাছি।" তারপর—ছেলে মানুষ—রমার গালে আঙ্গুল দিয়া বাবাকে বলিল, "বাবা, ওম্মা চুমু খা।" রমা ও ভববিভূতি দুজনেই এ কথায় লাল হইয়া উঠিল।

বিষম লজ্জায় ভববিভূতি অন্য কথা বলিয়া লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিল, "কি পড়ছো রমা ?"

রমা বা নয়নতারা ডাক্তারের কাছে কোনও দিন কোনও সঙ্কোচ করে না। নয়নতারার চিকিৎসার সময় হইতেই সে তাহাদের আপনার লোক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ এই খোকা মেয়েটার কাণ্ডে রমার যেন লজ্জায় কথা বাহির হইল না; সে মাথা নীচু করিয়া আড়ষ্টভাবে বলিল, "হিষ্টরি।"

"কার বই ?" "Rapsonএর Ancient India"। "বইখানা খুব ভাল। তুমি দেখ্‌ছি খুব বাইরের বই পড়! Matriculationএ তো এটা পাঠ্য নয় ?" "না।" "কোন্ বিষয় পড়তে তোমার খুব ভাল লাগে ?" এখন সঙ্কোচটা অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে। রমা বলিল, "হিষ্টরীর বই আমি খুব বেশী ভালবাসি।"

"তুমি Vincent Smithএর Early History of India পড়েছ ?"

"শুধু Alexanderএর Campaignটুকু, তা ছাড়া বাকীটা সব বুঝতে পারি না।"

হঠাৎ ভববিভূতির মাথায় কি খেয়াল চাপিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এত পড়বার ইচ্ছা, তা' তোমার বাবা তো তোমার বিয়ের চেষ্টা ক'রছেন। বিয়ে হ'লে কি তোমার পড়া হবে ?"

এ বিষয়ে রমার মোটে লজ্জা ছিল না; সেজন্য লোকে তাকে নিন্দাও করিত। সে অম্লানবদনে বলিল, "আমি বিয়ে ক'রবো না।"

"বিয়ে না করলে সারাজীবন কি ক'রবে ? মেয়েছেলেদের তো চাকরী-বাকরীর বেশী সুবিধা নেই। তোমার ইচ্ছা কি করা ?"

রমা বলিতে একটু কুণ্ঠিত হইল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা ডাক্তার হ'তে।"

"কেন ? ডাক্তারীতে কি বিশেষ আকর্ষণ আছে ? Practice যোগাড় করা তো বড় সহজ কাজ নয়, বিশেষতঃ মেয়েছেলেদের পক্ষে।" সঙ্কুচিতভাবে রমা উত্তর করিল, "আমাদের দেশে গরীব দুঃখাদের মধ্যে মেয়েছেলেদের উপযুক্ত রকম চিকিৎসা শুশ্রূষা কিছুই হয় না। আমি যদি ডাক্তারী ভাল ক'রে শিখতে পারি, তবে আমার ইচ্ছা যে

চিরকাল এই গরীব-দুঃখীদের শুশ্রূষা করবো, পয়সা নিয়ে Practice ক'রবো না।"

ভববিভূতি অবাক্ হইল। বিধাতা কি সব বিষয়ে ইহাকে তাহারই সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন! তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে শুধু বলিল, "বেশ কথা, এ খুব ভাল সংকল্প!" বলিয়া সে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রেণু বলিল, "বাবা, ও বাবা, ওম্মাকে চুমু খা—"

রমা তাহাকে তাড়াতাড়ি বলিল, "রেণু, যাও তো মা, ওই লাল ফুলটা নিয়ে এস গিয়ে।" রেণু ছুটিল। মাও পিছু-পিছু ঘরে গেলেন।

৮

ভবরঞ্জন আবার আসিলেন। এবার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি সদরালা বাবুর বাড়ী গিয়া নিজেই ভববিভূতির সহিত রমার বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। ভববিভূতি কিছুই জানিল না। রামবাবু উৎফুল্ল হইলেন। দেনা-পাওনার কথা তুলিতে ভবরঞ্জন বলিলেন, "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমাদের কিছুরই অভাব নাই। আপনার মেয়েকে আপনার যাহা ইচ্ছা দিবেন।"

কেহ সেখানে না থাকিলে রামবাবু নাচিয়া উঠিতেন। তিনি অবিলম্বে গৃহিণীকে সুসংবাদ দিতে গেলেন। নয়নতারাও উৎফুল্ল হইলেন। দিন স্থির হইল, পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে।

আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে জগদম্বা ভববিভূতিকে বলিলেন, "বাবা, আমি কাল রমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে যাব, তোর পছন্দমত যা' হয় কিছু কিনে দে।"

ভববিভূতি চমকাইয়া উঠিল। রমার সঙ্গে সেই সাক্ষাতের দিন হইতে রমার কথা লইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিয়াছে যে, রমার কথাবার্ত্তায় তাহার মন যে রমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেটা একটা দুষ্ট প্রবৃত্তি বই আর

কিছুই নয়। বিবাহ করিলে সে আদর্শ হইতে স্খলিত হইবে। তাহার মন তাহাকে বুঝাইল, যে, রমার মত প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইলে তাহার আদর্শলাভ সহজ ও মনোরম হইবে। সে বলিল, তাহা সত্য নহে। আদর্শের সহজ সিদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া কেবল তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ঠকাইতেছে। এই প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে পণ করিয়া বসিল। তাই মা যখন আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, সব ঠিকঠাক হইয়াছে, কাল তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন, তাহাতে সে চমকিয়া উঠিল।

সে বলিল, "সে কি মা? আমি তো তোমাকে বলেছি বিয়ে ক'রবো না।"

মা বলিলেন, "আমি তোর মা, আমি বল্‌ছি তোর এই মেয়ে বিয়ে ক'রতেই হ'বে। রামবাবুকে আমি কথা দিয়েছি, তোর জন্যে কি আমি মিথ্যাবাদী হব?"

ভববিভূতি একেবারে নুইয়া পড়িল। খানিক ভাবিয়া সে মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, তোমার সব আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, এইটি আমায় মাপ ক'রতে হ'বে। আমি রামবাবুর পায়ে ধরে তোমার সত্য ফিরিয়ে আনবো, আমায় ক্ষমা কর।" তা'র চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

জগদম্বা তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "আমি তোর তেমন মা নই বাবা, তোর মনের

কথা আমার কাছে লুকুতে পারবি নে। তোর মন খুব চাচ্ছে রমাকে বিয়ে করতে, কেবল তুই এক দুর্দান্ত প্রতিজ্ঞা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিস্। কিসের জন্যে মনের সঙ্গে এ যুদ্ধ বাবা? কি তোর লোকসান হবে? দুঃখীর সেবা? রমার মতন স্ত্রী পেয়ে যদি তোর দুঃখীর সেবা না হয়, তবে কি হ'বে একটা কাঠখোট্টা বেটাছেলের একার চেষ্টায়। তা ছাড়া, তুই তো তেমন নির্ঝঞ্ঝাট ন'স যে সন্ন্যাসী হ'য়ে এই কাজে লেগে পড়বি। তোর মেয়ে তো আছে। তাকে মানুষ করে কে? আমি বুড়োমানুষ, আমি কি অত পারি, না অত জানি? ওই ছুঁড়ীটাকে ভগবান পাঠিয়েছেন তোর মেয়েকে মানুষ ক'রতে!"

এ কথায় ভববিভূতি চমকিয়া গেল। রমা যে মাতৃত্ব পদবী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে সে তাহাকে ও রেণুকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিবে? সে বেশ বুঝিয়াছে যে, রমা ছাড়া রেণুর জীবন ঠিক পূর্ণ হইতে পারিবে না।

এমন সময় রেণু আসিয়া কাঁদিয়া নালিশ করিল যে "আয়া ওম্মা বাড়ী যায় না।"

ভববিভূতি তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিল, তারপর আয়াকে ডাকিয়া রমার কাছে রেণুকে লইয়া যাইতে বলিল। যাইবার সময় হাসিয়া জগদম্বা বলিলেন, "ওকে 'ওম্মা' বলিস না, ও তোর মা।"

রেণু হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ওম্মা না? মা? কি মজা!" সে রমার কাছে ছুটিল।

এদিকে রামবাবুর বাড়ীতে মহাবিভ্রাট্। জগদম্বা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রমা কাঁদিয়া একখানা করিয়া বসিল। মাকে বলিল, "আমি বিয়ে ক'রবো না।"

মা বলিল, "বিয়ে করবি নে কি রে? মেয়েছেলের কি বিবাহ না হ'লে চলে? পাগল মেয়ে দেখ না।"

রমা কাঁদিয়া বলিল, "আমি বিয়ে ক'রবো না, আমি ডাক্তার হ'ব।"

মা কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না। তখন রামবাবুর ডাক পড়িল।

রামবাবু মেয়েকে উপরের ঘরে লইয়া নির্জ্জনে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। নারীজীবনের আদর্শ, মাতৃত্বে নারীত্বের সার্থকতা, আমাদের শাস্ত্রকারদের কথা, ইউরোপের পণ্ডিতদের কথা, কত কথা বলিলেন। কিছুতেই রমা বুঝিল না। বলিল, "এত মেয়েছেলে ডাক্তারী ক'রছে, আমি কেন পারবো না।" রামবাবু বলিলেন, "এখনো সে দেশ বা কাল আসেনি, যাতে স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন ক'রতে পারে। তাদের একটা আশ্রয় দরকার। ভববিভূতির মত এমন আশ্রয়, তোমার সকল আদর্শের অনুকূল এমন একটা সহায় তুমি কোথায় পাবে মা?"

তবু রমা বুঝিল না। রামবাবু বলিলেন, আমি তোমাকে একখানা বই পড়তে দেবো। সে বই তোমাকে পড়তে দিতাম না ; কিন্তু তোমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, তার একটা সদুত্তর এতে পাবে ব'লে দিলাম। তুমি এই বইখানা পড়ে তার পর মত স্থির কর।" বলিয়া তিনি H G. Wellsএর নব-প্রকাশিত উপন্যাস Ann Veronica রমাকে দিলেন।

রমা বইখানা পড়িতে লাগিল। যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার আগ্রহ বাড়িয়া চলিল। সমস্ত বইখানা সে একদিনের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর সে ভাবিতে লাগিল ; ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না। পিতার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল ; কিন্তু বুঝিয়াও তাহার মন বুঝিল না।

বই শেষ করিয়া সে মায়ের কাছে গিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু রামবাবু তখনো ফেরেন নাই। সে Ann Veronicaর জীবনের ঘটনাগুলি মনে-মনে তন্ন-তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

নয়নতারা সস্নেহে বলিলেন, "কি মা, কি ব'লবো বাবুকে ?"

রমা বলিল, "বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তিনি আসুন।" Ann Veronicaর আলোচনা করিয়া সে সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, বিবাহ হয় তো তাহাকে করিতে হইবে ; কিন্তু

এখন সে কথার দরকার নাই, তার মেডিক্যাল কলেজে পড়া শেষ হইলে, পরে বিবাহের চেষ্টা করা যাইবে।

নয়নতারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিলেন না। তার পর মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, সত্যি ক'রে বল আমার কাছে; লজ্জা করিস নে, ভববিভূতি দোজবরে ব'লে তোর আপত্তি আছে কি?"

"দোজবরে!" সে কথা তো তাহার মনেই হয় নাই। যখন ভববিভূতির দীর্ঘ প্রশান্ত গৌর মূর্ত্তিতে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের আতিশয্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন তো তা'র একবারও মনে পড়ে নাই যে সে বিপত্নীক! রেণু তাহার আপনার মেয়ে! কথাটা মনে উঠিয়া যেমন মনে একটু খট্‌কা বাধিল, তেমনি আবার রেণুর কথা স্মরণ করিতে তার বাধা ভাসিয়া গেল। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

"তবে কি তাকে অন্য কোনও কারণে অপছন্দ হচ্চে?"

"যাও, অপছন্দ কে ব'লছে? আমি বিয়ে ক'রবো না, তাই।"

মায়ের এই সব প্রশ্ন তাহার মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, ভববিভূতির পক্ষে সে মনে-মনে ওকালতি করিতে লাগিল। এমন যে মহাপুরুষ, তাকে স্বামীরূপে পাওয়া যে নারীমাত্রেরই সৌভাগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এই কথা সে মনে-মনে বলিল। স্থির করিল, বিবাহ যদি

করিতেই হয়, তবে এমন স্বামীই যেন তাহার হয়। কিন্তু এমন যে দু'টি হয় না, সেটা তাহার মনে স্পষ্ট করিয়া জাগিল না। আমরা যাকে দেখি, বা যার কথা ভাবি, তার কতখানি যে আমাদের মনের গড়া, সেটা রমা জানিত না। তাই তার মনগড়া এই ভববিভূতি, তার প্রেমে বঞ্চিত এই যে মানুষের মূর্ত্তি, এর যে আর জোড়া পাওয়া যাইবে না, সে কথা সে বুঝিল না।

এমন সময় হাসিতে হাসিতে রেণু ছুটিয়া আসিল, বলিল, "ওম্মা, তুমি ওম্ম' না, মা। থাকুমা বোলেছে।" সটান রমার কোল জুড়িয়া বসিয়া সে হাসিতে হাসিতে রমার গাল ধরিয়া বলিতে লাগিল, "মা! কি মজা!"

রমা হাসিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত হৃদয় স্নেহধারায় আপ্লুত হইল, কিন্তু লজ্জায় সে লাল হইয়া গেল।

নয়নতারা হাসিয়া বলিল, "এই নে, আমরা তো হার মেনে গেলাম, তোর মেয়েকে তুই কি বলে বোঝাবি বোঝা।" তার পর বলিলেন, "হাঁ রমা, বিয়ে যে করবিনে, তা রেণুকে ছেড়ে থাক্‌বি কি ক'রে।"

রমা চুপ করিয়া রহিল। কেবল সে রেণুকে বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিল।

রামবাবু আফিস হইতে আসিলেন, কিন্তু রমার আর তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলার দরকার হইল না।

পরদিন জগদম্বা রমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

ঠানদিদি

১

সকলে তাঁহাকে বলিত ঠানদিদি। তা'ছাড়া তাঁর যে অন্য নাম ছিল, তাহা কেহ জানিত কি না সন্দেহ। ঠানদিদি বলিয়া তিনি বুড়ী ছিলেন না। বয়স তাঁহার বছর চল্লিশ, কিন্তু সমস্ত শরীরে তাঁর একটা নিটোল সৌষ্ঠব ছিল—যাহা দিন-রাত বয়সকে টিট্‌কারী দিত। তাঁর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য চলচল করিত, চক্ষে তাঁহার বিজলী খেলিত, অলঙ্কারহীন সহজ স্থির যৌবন তাঁহাকে যেন আগাগোড়া ছাইয়া শোভামণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য মিনমিনে ধরণের নয়, বেশ লম্বা-চওড়া, আগাগোড়া স্পষ্ট ও বৃহৎ—যেন গ্রেট অক্ষরে ছাপা একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ।

ঠানদিদি বিধবা, তাই তাঁহার গহনা নাই। তিনি মাছও খান না, সাদা কাপড়ও প্রায় পরেন। ইহা ছাড়া বৈধব্যের অপর লক্ষণ তাঁহার ভিতর নাই। অধরে তাম্বুলরাগ মাঝে মাঝে তাঁহার না দেখা যাইত এমন নহে। একাদশীতে ভাত খাইতেন না, কিন্তু যে ভোজনের আয়োজন হইত, তাহাতে অতৃপ্তির কোনও কারণ ছিল না।

আর সদাসর্ব্বদা তিনি যেমন হাসিয়া গাহিয়া রঙ্গরসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তাহা বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না।

ঠানদিদির নিন্দার অন্ত ছিল না। সতী-সাধ্বীরা তাঁর নাম করিলে আচমন করিতেন। অসতী বলিয়া তাঁর অপবাদ ছিল—সে ত তুচ্ছ কথা। দু' একজন সেকেলে বুড়ী ইহাও রটাইয়াছিলেন যে, তিনি আপন হাতে বিষ দিয়া স্বামীকে বধ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ঠিক খবরটা কেহ বলিতে পারিত না, কেন না, সে বিশ বছরের কথা—আর তাঁ'র স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল দূরদেশে তাঁর কর্ম্মস্থানে। এখন ঠানদিদি থাকেন পাড়াগাঁয়ে।

এত বড় পাপিষ্ঠাকে কিন্তু গাঁয়ের লোকে যে ঘৃণা করে, সে কথা তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। ঠাকুরঘরের দুয়ারের কাছে তিনি আসিলে সবাই কোনও না কোনও অছিলায় তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ বলিত না—তুমি এখানে আসিও না। কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণের রান্না রাঁধিতে কেহ তাঁহাকে ডাকিত না, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁহার সব বাড়ীতেই ডাক পড়িত ; কারণ, এই নিভৃত পল্লীতে কেহ তাঁর মত নানা রকমের খাবার তৈয়ার করিতে জানিত না। আর ঠাকুরাণী যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই শোভন সুন্দর অমৃততুল্য হইয়া উঠিত।

সকল রকম শিল্পে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। রোগে তাঁর মত সেবিকা গ্রামে কেন, দেশে কোথাও ছিল না। পাশ-করা শুশ্রূষাকারিণী তাঁর কাছে লাগে না।

ঠানদিদি মিষ্টভাষিণী, পরোপকারিণী। তিনি বিশ বছর আগে যে দিন বিধবা হইয়া মিরপুর গ্রামে পা দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত কেবল দশজনের কাজে ব্যয় হইয়াছে। নিজের তাঁহার কিছু করিবার ছিল না, তবে সকলের সব কাজ সারিয়াও রোজ নিজের আহারের পরিপাট্যের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ব্রত উপবাস নিয়ম তিনি করিতেন না। কোনও দিন কোনও ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে কেউ গড় হইতে দেখে নাই, নিজেও দীক্ষা লন নাই।

এমন একটি অদ্ভুত মেয়েমানুষ যখন প্রথম গাঁয়ে আসিয়া বসিল, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার উপর মহা ক্ষিপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই স্ত্রীলোকটির ক্ষমতা। বৎসর না ফিরিতে সে সকলকে বশ করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ সুদর্শন ভট্টাচার্য্য একদিন তা'কে যা'নয় তাই বলিয়া গালি দিল, তা'র ঠাকুর দালান হইতে বিদায় করিয়া দিল। ঠানদিদি হাসিয়া বামা দাসীকে বলিলেন, "ঠাকুর বলেছেন ঠিক; দেবতাদের সঙ্গে আমার যে আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক, তাতে ওঁদের ওদিকে আমার না ঘেঁষাই ভাল।" চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের পত্নী প্রথম সাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন, ঠানদিদি হাসিয়া বলিলেন, "দিদি, শেয়াল-কুকুরকে কি চোখ দিয়েও দেখ্‌তে নেই ; নেহাৎ 'দু'ঘা মার্‌তেও তো দেখ্‌তে হয়।" মোটের উপর, কড়া কথা বা কটু ব্যবহার ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁর হাসিভরা মুখ ও বুকভরা সেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন তিনি তাঁদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কেহ তাঁহাকে আর ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না।

২

আমার বিবাহ হইবার পর ঠানদিদি হইলেন আমার প্রধান সখী। তিনি আমার মায়ের বয়সী, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে আমার কোনও দিন একটুকু দ্বিধা হয় নাই, বরং শ্বশুরবাড়ীর সঙ্কোচটা তাঁহার সহৃদয়-স্পর্শেই আমার কাটিয়াছিল। তিনি আমার সহিত রহস্য করিতেন, কিন্তু ঠানদিদি সম্পর্কের আর দশজনের মত ছেবলামী করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। তাঁহার কথাবার্ত্তার লঘুত্বের ভিতর এমন একটা শান্ত মাধুরী ছিল যে, সে কথায় মন পাতলা হইত, কিন্তু তাহাতে মলা লাগিত না, ক্লান্তি আসিত না।

কালে কালে আমি ঠানদিদির একেবারে অন্ধ উপাসক হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার সখী ও সহচরীও বটে। আর আমার সব বিষয়ের গুরুও বটে। এমন কোনও কথা ছিল না—যা'তে তাঁর কথা বেদবাক্যের মত না মানিতাম। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বিধবার অযোগ্য অনাচার আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতাম না। একদিন পান সাজিতে বসিয়াছি, তাঁকে একটা সাজিয়া দিলাম, তিনি খাইলেন। আমি বলিলাম, "ঠানদি, তুমি পান খাও কেন?"

"মর্ পোড়ারমুখী, একটা পান যদি বা হাতে তুলে

দিদি, তার আবার খোঁটা দিচ্ছিস ?" বলিয়া স্নিগ্ধ হাস্যময় সুন্দর চক্ষু আমার মুখের উপর রাখিলেন।

আমি বলিলাম, "রজ রাখ ঠানদি, আজ তোমায় আমি ছাড়ছি না। তোমায় বলতেই হবে, তুমি এ সব অনাচার কর কেন ?"

"যা করতে নেই, তা' করলে কি হয় ?"

"পাপ হয়।"

"পাপ করলে কি হয় ?"

"কে জানে কি হয় ; পাপ করতে নেই, তাই জানি।"

"আমি জানি, পাপ করলে নরকে যায়, সেখানে খুব শাস্তি পায়।"

"এ কথা তুমি মান ?"

"হাঁ, আরও মানি যে, বিধবা যদি আচার-নিয়ম মেনে, দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, সমস্ত জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করে, তবে তার পুণ্য হয়, সে স্বর্গে যায়, অনন্তকাল স্বামীর সহবাস করে।"

ঠানদিদির মুখের হাসিটা যেন একটু ঘোর হইয়া উঠিল।

আমি অবাক্ হইলাম, বলিলাম, "এত যদি মান, তবে নিষ্ঠা-আচার-নিয়ম কর না কেন ?"

"আমি স্বর্গে যেতে চাই নে ব'লে, আর স্বামীর ঘাড়ে আর চাপতে চাইনে ব'লে, নরকে প'ড়তে চাই ব'লে,— বুঝলি ?"—বলিয়া ঠানদি আবার হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "আবার ঠাট্টা ? আজ তোমায় সত্য কথা বল্‌তেই হ'বে।"

"ঠাট্টা নয় দিদি, খাঁটি সত্য।"—ঠানদিদির চোখটা একটু ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় আমার ছয় মাসের খোকাটি আসিয়া কখন্ পানের থালাটি ধরিয়া টান মারিয়াছে, আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে দেখিতে সব ক'টি পান মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি খোকার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিলাম, "মরণ হয় না, মুখপোড়া!"

ঠানদিদি অমনি "ষাট্ ষাট্" বলিয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন! মহাব্যস্ত হইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, "দেখ্ বিমলা, এমন কাজটি আর করিস্ না, ভুলেও—স্বপ্নেও যেন এমন অলক্ষণে কথা মনেও আনিস্ না।"

আমার প্রাণে তখন বড় অনুশোচনা হইতেছিল, কিন্তু বলিলাম, "সাধে কি বলি ঠানদি, দেখ দিকিন্ পানগুলো কি ক'রে দিলে ?"

"হাঁরে পোড়ারমুখী, তুই তো কথাটা ব'লে দিয়েই খালাস, কথাটা গিয়ে কোন্ দেবতার কানে উঠে, মনে গাঁথা রইল, সে খবর তো তুই রাখিস্ না। ষাট্ ষাট্ বাছা ষাট্ ষাট্।" ঠানদিদির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আমি কিছুক্ষণ কথা কহিলাম না, মনে মনে

ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা কুটিলাম, আমার বাছার যেন অকল্যাণ না হয়। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, শেষে আমি বলিলাম, "হাঁ ঠানদিদি, দেবতারা কি মানুষের কথা শুনেন? তবে মানুষ যে দিন-রাত এত মানত কর্‌ছে, কই, কার কি হচ্ছে?"

ঠানদিদি চোখের জল মুছিতে মুছিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, তাঁরা মানুষের কথা শোনেন, রাখেনও; কিন্তু সে কেবল তা'দের শাস্তি দেবার জন্য। আমার মনের একটা বড় গোপন কথা শুনে তাঁরা আমায় কি শাস্তিই দিয়েছেন!"

ঠানদিদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ্ বিমলা, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি, আমি অনাচারী কেন? সে কথা তোকে খুলে বল্‌বো। কথা শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বি, ভগবান্ কেমন ক'রে আমাদের কথা রাখেন!"

ঠানদিদি তাঁর জীবন-কাহিনী বলিলেন।

৩

ঠানদিদির কথা

আমি যৌবনে বড় সুন্দরী ছিলাম। আমার স্বামীও পরম সুপুরুষ ছিলেন। স্বামী মজঃফরপুরে বড় চাকরী করতেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল, মেয়েমহলে আমার খ্যাতি তাঁর চেয়ে কম ছিল না।

স্বামী আমাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন বুঝি কোনও স্বামী কখনও কোনও স্ত্রীকে বাসেনি। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসিতাম। সারাদিনরাত্রি আমার সব কাজ, সব চিন্তা কেবল আমার স্বামীকে ঘিরিয়া থাকিত। তিনি সে কথা জানিতেন, আর আমার ছোট ছোট সেবা ও ছোট ছোট কথায় যে চরিতার্থতা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিত, তাহাতে আমার হৃদয় গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিত। ভাবিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমার বয়স যখন উনিশ, তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ। সেই সময় তাঁর একটা পদোন্নতি হইল, কাজও অনেক বাড়িয়া গেল। আগে যেমন দিন-রাত তাঁহাকে আমার কাছে পাইতাম, এখন আর তাঁহাকে তেমন পাই না। বাড়ীতেও তিনি সদাসর্ব্বদা কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ঘটিয়া উঠিত না।

এই সময় একদিন আমি জানালার ধারে বসিয়া আছি, দূরে রাস্তা দিয়া এক নীলকর সাহেব যাইতেছে। এমন সময় স্বামী পিছনদিক্ হইতে আসিয়া বলিলেন, "কি গো সতি, অমনি ক'রে বুঝি বিরহযাপন করছ ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি রকম ?" অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁহাকে পাইয়া আমার সমস্ত শিরায় শিরায় নাচন উঠিয়াছিল, সে কথা তাঁর কাছে গোপন রাখিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, "বলি, ডেভিড সাহেবের সহিত কি প্রেমালাপ হচ্ছিল ?" বলিয়া তিনি আমার চিবুক টিপিয়া ধরিলেন।

"যাও" বলিয়া আমি মহারাগ করিয়া সরিয়া গেলাম। তিনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, "মাফ কিজিয়ে মেম সাব, গোস্তাকী কিয়া।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মাফ করা গেল, কিন্তু এমন গোস্তাকী যেন আর না হয়।"

কিন্তু এমন গোস্তাকী তাঁর প্রায় হইত।

এমন সময় আমার পিসতুতো দেবর শচীকান্ত আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। সে তখন এম-এ পড়িতেছে. শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় সে মজঃফরপুরে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে।

শচীকান্তের বয়স তখন একুশ বাইশ। সুন্দর না

হইলেও তাহার শরীরে সৌষ্ঠব ছিল, আর চক্ষু দু'টি তা'র এক অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল ছিল। কথাবার্ত্তায় সে অদ্বিতীয়। তার কথায় ও তার ভাবভঙ্গিতে এমন একটা মিষ্ট মোহের সৃষ্টি করিত যে, একবার বসিলে আর তা'র কথা ফেলিয়া কেহ উঠিতে পারিত না।

শচীকান্ত হইল আমার অবসরের সঙ্গী, কর্ম্মে সহচর। দিন-রাত সে কাছে কাছে থাকিত, দিন-রাত তা'র মধুময় কথা শুনিতাম, শুনিয়া তৃপ্তি হইত না।

একদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাংলার বারান্দায় বসিয়া আমি জামা সেলাই করিতেছি, শচীকান্ত একখানি বই লইয়া বসিয়াছে। বই কোলে রাখিয়া শচী গল্প করিতে লাগিল, আমিও সেলাই কোলে রাখিয়া শুনিতে ও মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগিলাম। বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, তাহারও পড়া অগ্রসর হইল না, আমার সেলাইও যেমন তেমনি রহিল।

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি অন্যমনস্কভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি গো, এত শীগ্‌গির ফিরে এলে?"

"বড্ড মাথা ধ'রেছে" বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। সে দিকে আমার মোটেই মন ছিল না বলিয়া সে কথা আমার কানেই গেল না। আমি শচীকান্তের

কথা শুনিতে লাগিলাম। খানিক পরে তা'র কথাটা শেষ হইলে ঘরে গিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "বড্ড মাথা ধ'রেছে কি?" ঘরে আসিযাই আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বুঝিয়াছিলাম যে, আমার বড় ত্রুটি হইয়াছে,—তাঁর পিছু পিছু ঘরে না আসায়। তাঁর মাথার যন্ত্রণা আমার সেবার মত অন্য কোনও উপায়ে আরাম হইত না।

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না—যাও।"

আমার বুকের ভিতর দুড়্‌-দুড়্‌ করিয়া উঠিল। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। এক গ্লাস জলে ওডিকোলন ঢালিয়া আনিয়া বলিলাম, "এসো, মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে বাতাস করি।"

তিনি কিছু না বলিয়া আমার হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া মাথা ধুইয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আমি নিতান্ত অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার বুক ঠেলিয়া কি যেন-একটা উঠিতে লাগিল। খানিক বাদে আমি নিঃশব্দে পাখা লইয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। স্বামী কিছু বলিলেন না।

শচীকান্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার কি অসুখ ক'রেছে?"

স্বামীর মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। আমি শচীকান্তকে ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিতে বারণ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলাম। তাহার মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি দেখিলাম, স্বামী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল; বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলেন; আমি পাখা রাখিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। সেখানে শচীকান্ত একখানা তক্তপোষের উপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

আমি গিয়া বসিতেই তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহাতে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। আমি যেন একটু কাঁপিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া সেই তক্তাপোষের উপরে বসিয়া পড়িলাম।

তার পর ক্রমে একথা ওকথা হইতে হইতে আমার সঙ্কুচিত ভাবটা কাটিয়া গেল, শচীকান্ত তাহার সেই প্রাণস্পর্শিভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমি আগ্রহের সহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিলাম। কথাটা অতি তুচ্ছ, তাহাদের কলেজের কোন প্রফেসারের কেমন হাস্যকর বিশেষত্ব আছে, তাই সে বর্ণনা করিতেছিল।

কিন্তু সে কথাগুলি এমন সরল করিয়া বলিত আর তার গলার আওয়াজ এত আশ্চর্য্য মিষ্ট ছিল যে, যত তুচ্ছ কথা হোক না কেন, কান পাতিয়া শোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

এমন করিয়া কতক্ষণ গেল, বুঝিতে পারিলাম না। যখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইতেছে, এমন সময় শচীকান্ত বলিল, "বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই আমায় রাখ্‌বে না কি? খাবার দাও।" আমি লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, শচী একাগ্রচিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, আমি লজ্জিত নববধূর মত ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম।

মিথ্যাকথা কহিব না। শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল; কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তাহার উপর রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়াইয়া দিলাম, হয় তো বা আশাও দিলাম।

ঘরের ভিতর আসিতেই দারুণ বেদনা অনুভব করিলাম। আমার চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার কান্না পাইতে লাগিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল, শচী আমাদের এখানে আসিল কেন?

আকাশপাতাল ভাবিতে ভাবিতে খাবারের থালা

লইয়া শচীকান্তকে দিতে গেলাম ; এবার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াই গেলাম—আর তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমি গম্ভীরভাবে খাবারের থালাটি রাখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সে বলিল, "ওরে বাপ রে, এ যে গন্ধমাদন পর্ব্বত ; এতগুলো আমি খাব কি ক'রে ?"

আমি বলিলাম, "তার মানে আমি হনুমান্। বলি, এমন কত গন্ধমাদন তোমার পেটে রোজ কতটা যায়, খবর রাখ কি ?"

হায়, কোথায় গেল আমার গাম্ভীর্য্য, কোথায় গেল আমার আত্মরক্ষার আয়োজন !

সে বলিল, কিছুতেই সে এতগুলো খাইতে পারিবে না, এবং ধরিয়া বসিল, আমাকে তাহার সঙ্গে খাইতেই হইবে। আমি তাহার পীড়াপীড়ি এড়াইতে পারিলাম না। আমার কেমন একটা অবস্থা হইয়াছিল যে, সে কিছু জোর করিয়া ধরিলে আমি "না" বলিতে পারিতাম না। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আমি একটা মিষ্টি তুলিয়া খাইলাম। সে বলিল, "ওতে হবে না, এই পানতুয়াটা নিতে হ'বে।" আমি অস্বীকার করায় সে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া পানতুয়াটা হাতে গুঁজিয়া দিল। আমার শিরার ভিতর রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় স্বামী আসিয়া সম্মুখ দিয়া বারান্দায়

ঢুকিলেন। আমার সমস্ত শরীর একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে সাহস হইল না।

তিনি যে কখন্ বিছানা হইতে উঠিয়া ভিতরের দিক্ দিয়া বাগানে বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং কতক্ষণ যে সেখানে পায়চারী করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আমি কোনও খবর রাখি নাই। খাবার আনিবার সময় ঘরে গিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তখন আমি এত তন্ময় হইয়াছিলাম যে, তাঁহার কথা মনেই হয় নাই এবং তিনি বিছানায় আছেন কি না, লক্ষ্য করি নাই।

আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ভাঙ্গা গলায় বহুকষ্টে বুকের কাঁপুনি চাপিয়া বলিলাম, "কখন্ উঠলে তুমি?"

স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "সে খবর নেবার তো অবসর হয়নি, দেওরটি নিয়েই ব্যস্ত আছ।" তাঁর মুখ প্রশান্ত, কিন্তু যেন একটা ক্ষীণ বিষাদের ছায়ায় আবৃত।

এ কথায় আমি অসম্ভব লাল হইয়া উঠিলাম, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘামিয়া উঠিল। ডেভিড সাহেবের কথায় তো কখনও এমন হয় নাই।

শচীকান্তও যেন কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে খাবার খাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, আমি কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "মাথাটা ছেড়েছে কি?"

স্বামী বলিলেন, "হাঁ, অনেকটা।"

আমি বলিলাম, "খাবার দেব কি ?"

স্বামী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার কি আর খাবার দরকার আছে ? তোমাদের তো হয়ে গেল দেখ্‌ছি। আমার তো একবার খবরও কর্‌লে না ?"

তাঁহার কথার ভাবে আমার মনের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁর খাবার আনিয়া দিলাম এবং চা করিয়া দিলাম। তার পর কথা-বার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমার মন অনেকটা পাতলা হইয়া আসিল।

৪

রাত্রে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আজকার ঘটনায় আমার স্পষ্ট জ্ঞান হইল যে, আমি একটা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া ছুটিয়াছি—এই শচীকান্তের দিকে। আমার হৃদয় কত দূর চঞ্চল হইয়াছে, কি এক বিষম নেশায় আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিজের মনের কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনের ভিতর সে তিরস্কার পৌঁছিল না, শচীকান্তের কথামাত্রে প্রাণের ভিতর এমন একটা পুলকের ঢেউ উঠিল, তার সাম্‌নে সব যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলাম, "আমায় এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর।" কিন্তু সে কথা মুখেই রহিল, প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, সে বলিল, "এ সুখের নেশা যেন ভাঙ্গে না!" আপনার ভিতর এ বিরোধ লইয়া আমি পর পর সুখ ও দুঃখের বেদনায় একেবারে চুরমার হইবার মত হইলাম। শেষ আমার সুপ্ত স্বামীর পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কাঁদিলাম দুঃখে—নিজের ভিতরকার এই যুদ্ধের অসহনীয় বেদনায়! কাঁদিলাম,—আমি ভাল হইতে চাহিতে

পারিলাম না বলিয়া! আর কাঁদিলাম সত্য দুঃখে,—আমার স্বামীর হৃদয়ের জ্বালা অনুভব করিয়া। বেচারা সমস্ত জীবন আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছে, আমা বই কিছু জানে না, তার প্রাণে এ সন্দেহের বেদনা কি নিদারুণ, তাই ভাবিয়া কাঁদিলাম। আমার পোড়ার মুখ, আমি তার এ বেদনার কেন সৃষ্টি করিলাম!

কতক্ষণ এমনি করিয়া শুইয়াছিলাম, জানি না। জাগিয়া দেখিলাম, স্বামী আমার মাথা বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার বুক প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে। আমি জাগিতেই তিনি বলিলেন, "তোমার উপর আমি বড় অবিচার করিয়াছি! তোমার ভালবাসায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিয়াছি, এটা বড় নিষ্ঠুরের কাজ হইয়াছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

আমি আমার কালামুখ তাঁর বুকের ভিতর লুকাইলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া আবার সেই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার উঠিতে কিছু দেরী হইয়াছিল, স্বামী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বরাত্রের সে অনুশোচনার তীব্রতা তখন যেন আশ্চর্য্যরকম কাটিয়া গেল; বরং আমার মনশ্চাঞ্চল্যের স্বপক্ষে নানা ওজর খুঁজিতে লাগিলাম। স্বামীর সন্দেহটা দূর হইয়াছে, তাহাতে অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ

করিলাম। মনটা আবার কেমন ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া খাবার করিতে গেলাম; চা' করিলাম—সব অন্যমনস্কভাবে! আমার মনের ভিতর কেবল এক অপূর্ব্ব মধুর সুর বাজিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, এটা অন্যায়, কিন্তু তখনি সে চিন্তাকে সরাইয়া দিয়া আবার মনের আবেগ আপন পথে ছুটিয়া চলিতে লাগিল, আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইলাম। ক্রমে শচীকান্ত কাছে আসিয়া জুটিল, আমি সকল চিন্তা, সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহার প্রীতি-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা সবই অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু আমি বুঝিলাম, তাহার মনের ভিতর কিসের ঢেউ খেলিয়া এই সব তুচ্ছ কথার ভিতর দিয়া আপনার রসের ধারা মিলাইতেছে। সেও যে আমার মনের কথা বুঝিল, তাহাতেও আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু আমাদের ভিতর শুধু একটা চোখের পর্দ্দার অন্তরাল রহিয়া গেল।

আমার স্বামীর নিকট হইতে আমার মন যে কখন্ অলক্ষিতে সরিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই দেখিলাম, স্বামীর সঙ্গ আমার কাছে প্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিতে হইত, ততক্ষণ যেন একটা বোঝা ঘাড়ে চাপিয়া থাকিত;

তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। মাঝে-মাঝে এমন কি, তাঁকে একটা আপদ্ বলিয়া মনে হইত। যখন আমরা দু'জনে—আমি আর শচীকান্ত বসিয়া বেশ গল্প জমাইয়া লইয়াছি, সে সময় যদি তিনি আসিয়া বসিতেন বা আমাকে ডাকিতেন, তবে আমার মনটা যেন বিষ হইয়া উঠিত, মনে হইত, আপদ্ গেলে বাঁচি। কথাটা মনে হইলেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি বাধা দিত, মনে মনে বলিতাম, বড় অন্যায় করিতেছি! কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপদ্রবটা ক্রমশঃই বেশী গা-সওয়া হইয়া উঠিতেছিল।

ইহার পর হইতে আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। প্রায়ই তিনি আফিস হইতে অসময়ে মাথা ধরিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে স্থির বুঝিলাম যে, ইহা কেবল আমাকে জব্দ করিবার ফন্দী, অসময়ে হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখিতে চান, আমি ও শচীকান্ত কি করিতেছি। এ কথা ভাবিতে আমার বড় রাগ হইত। এত অবিশ্বাস! আমি করিয়াছি কি? শচীকান্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র অন্যায় কিছু আছে, এ সময় আমি তাহা মনের কাছে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতাম না, কেবল দিন-রাত নিজের কাছে নিজের সাফাই গাহিতাম, আর মনকে বুঝাইতাম যে, আমি কোনও দোষ করি নাই, আমার স্বামীরই অন্যায় সন্দেহ!

দোষ আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার অন্তর যে স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং শচীকান্তের উপর অনুরক্ত, এ কথা তখন ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

আমার আরও রাগ হইত আমার অদৃষ্টের উপর। আমি কোনও দোষ করি নাই, কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের যে, যখনি হঠাৎ আমার স্বামী আসিয়া পড়িতেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি আমাদিগকে এমন একটা অবস্থায় দেখিতেন—যাহাতে হঠাৎ লোকে সন্দেহ করিতে পারে। একদিন আমরা বাগানে বেড়াইতেছি, শচী আমার পশ্চাতে পশ্চাতে কপিক্ষেতের আইল দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ আমি পা হড়কাইয়া পড়িবার মত হইলে শচী পিছন হইতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল, আমার চুল খুলিয়া তাহার পিঠের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িল। আমি সাম্‌লাইয়া উঠিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী ঠিক তখনি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমার সহিত দেখাদেখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। আর একদিন আমরা পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিয়া কথা কহিতেছি, একটা মশা আসিয়া আমার চোখের পাশে বসিল; শচী যাই মশাটা মারিবার জন্য একটা থাপ্পড় দিয়াছে, অমনি স্বামী আসিয়া উপস্থিত। আমরা দু'জনেই মহা অপ্রস্তুত হইয়া ভেবাচেকা খাইয়া

গেলাম। শচী বলিল, "পার্‌লাম না, মশাটা উড়ে গেল।" কথাটা সত্য হইলেও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা শুনাইল—যেন একটা বাজে ওজর। এমনি প্রায় রোজ একটা-না একটা কিছু হইত—যা বাস্তবিক কিছু দোষের নয়, কিন্তু যা দেখিয়া স্বামী নিশ্চয় একটা ভয়ানক অন্যায় কিছু মনে করিতেন। আর তা'তে আমরা দু'জনেই সাহায্য করিতাম,—আমাদের ব্যবহার দ্বারা। এই রকম অবস্থায় স্বামী আমাদের দেখিলেই দু'জনেই যেন কেমনতর হইয়া যাইতাম—মুখ, চোখ, কান লাল হইয়া উঠিত, হয় তো এমন একটা কথা, এমন একটা অযাচিত ব্যাখ্যা দিতাম, যাহাতে সন্দেহ বাড়িত বই কমিত না।

আসল কথা এই যে, আমরা তিন জনেই পরস্পরের মনের ভাব খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু যেন বুঝি নাই, এমনি ভান করিয়া সবাই সবার সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছিলাম—তাই আমাদের এ বিপত্তি।

আমার যে অনুশোচনা না হইত, এমন নহে; কখনও কখনও নিরিবিলিতে কাঁদিয়া চক্ষু ভাসাইতাম; কিন্তু এই সকল সময়ে যখন স্বামীর অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিতাম, তখন যেন আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। মনকে কেবলি বুঝাইতাম, তিনি আমাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করিতেছেন। হৃদয় তাঁহার উপর বিষাক্ত হইয়া উঠিত; এক এক সময় মনে হইত, যে আমার উপর এমন অন্যায়

সন্দেহ করে, এক মুহূর্ত্তও আর তাহার সহিত যেন বাস করিতে না হয়।

একদিন আমি বাড়ীর ভিতর কাজ সারিয়া বারান্দায় আসিতেছি, দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দুই ভাইয়ে কি কথা হইতেছে। আমি অগ্রসর না হইয়া কান পাতিয়া রহিলাম। কথা হইতেছিল—শচীকান্তের পড়া-শুনা সম্বন্ধে। স্বামী বলিলেন, "তোর আর এবার একজামিন দেওয়া হবে না। এখানে থেকে যা পড়্‌ছিস্, তাতে তো থার্ড ক্লাশও হইবার সম্ভব নেই।"

শচীকান্ত যেন কতকটা বিব্রত কতকটা উত্তপ্ত হইয়া উত্তর করিল, "এ পর্য্যন্ত তো কোনও একজামিনে ফার্ষ্ট ক্লাশের নীচে হইনি, একটু দেখই না, এবার কি হয়, তার পর বলো।"

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যা'ক্।" তা'র পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাসিয়া বলিলেন, "আমি বলি, এই সময় একটু চেষ্টা-চরিত্র কর্। কল্‌কাতায় গিয়ে এ দু'মাস প'ড়ে যাতে ভাল হ'তে পারিস, তা'র চেষ্টা দেখ্।"

কথাটা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, শচীকান্তকে কলিকাতায় পাঠাইবার গরজের কারণ আমি। পড়া-শুনায় শচীকান্ত খারাপ হইতে পারে, এ কল্পনাও আমার কখনও আসে

নাই, কাজেই সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। এ সব যে কেবল শচীকান্তকে আমার নিকট হইতে দূর করিবার ফিকির সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র রহিল না। আমি অক্ষম রোষে আপনি পুড়িতে লাগিলাম। বারান্দায় না গিয়া ঘরের ভিতর বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম।

এখন ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়, তখন আমার বোধ হইতেছিল, যেন স্বামী আমার জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। অপমানে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল। ভাবিতে-ছিলাম, 'হায়! এ অপমানের হাত হইতে উদ্ধার হইবার কোনও উপায় নাই কি?' কত অসম্ভব কল্পনা আমার মাথায় আসিতে লাগিল। স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া স্বাধীন হওয়া একটা কল্পনাপ্রিয় দুরাশার মত আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বৈধব্যের কল্পনাও প্রীতিকর বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে, লজ্জার কথা বলিব কি, শচীকান্ত আমার সেই পতিবিহীন জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গেল। বিধবা-বিবাহ, দেবরের সহিত পরিণয় প্রভৃতি কত কল্পনা আমার যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনের উপর দিয়া ছবির মত ভাসিয়া গেল—সে কল্পনায় আমি একটা অমানুষিক আনন্দের কম্পন শরীরের ভিতর অনুভব করিলাম।

পরক্ষণেই মনকে সংযত করিলাম; কল্পনার মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া নিজেকে একটু তিরস্কার করিলাম। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ মুহূর্ত্তের অসাবধান প্রচ্ছন্ন কামনা

দেবতার হৃদয়ে ছাপ মারিয়া দিল; তিনি আমার এই দুর্দ্দান্ত কামনা পূর্ণ করিয়া আমার চরম শাস্তির বিধান করিলেন।

আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা একটু বেশী হইতেছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, সেটা শুধু আমাদের জব্দ করিবার একটা অছিলামাত্র। কিন্তু শীঘ্রই দেখিলাম, আমার অভিযোগ মিথ্যা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর আশ্চর্য্যরকম রোগা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমার অন্ধ নয়নে তখন সেটা পড়ে নাই। একদিন তিনি আফিস হইতে খুব বেশী মাথা-ধরা লইয়া ফিরিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর আসিয়া দেখি, তিনি তেমনি পড়িয়া আছেন, গায় হাত দিতে দেখিলাম, ভয়ানক জ্বর। আমি থারমমিটার আনিয়া সাবধানে তাহা লাগাইলাম। জ্বর ১০৬ ডিগ্রীরও উপর। দেখিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন মুহূর্ত্তের জন্য অসাড় হইয়া গেল, আমি ছুটিয়া শচীকান্তকে ডাক্তার ডাকিতে বলিলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই, মস্তিষ্কের জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। ঔষধ আনিতে দিয়া তিনি শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তা'র পর ঔষধ আসিলে এক দাগ খাওয়াইয়া তিনি বলিলেন,

"একবার ডাক্তার সাহেবকে ডাকাও, অবস্থা গুরুতর বোধ হইতেছে।"

আমার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলাম, গত দুই মাসের সমস্ত ঘটনা অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার উপর যত অবিচার অত্যাচার করিয়াছি, তাহা মনে হইয়া আমাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। আর সর্ব্বোপরি তাঁর সমস্ত হৃদয়ভরা স্বার্থ-বিসর্জ্জিত ভালবাসার যে অপমান করিয়াছি, তাঁহাকে যে মিথ্যা স্নেহ দেখাইয়া বঞ্চনা করিয়াছি, সেই সব কথা মনে ভাবিতে যেন আমার মাথার নাড়ীগুলি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, এমন বানরীর কণ্ঠে ভগবান্ কেন এ মুক্তাহার ঝুলাইয়াছিলেন!

ডাক্তার বাবু আমার স্বামীর বন্ধু। তিনি বলিলেন, "স্থির হ'ন মা। এ সময় আপনি অস্থির হ'লে কে কি কর্‌বে বলুন।"

কথাটা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। এক মুহূর্ত্তে যেন আমার ভাবপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিয়া আমি স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার সাহেব আসিলেন, আরও দুইজন ডাক্তার আসিলেন, তাঁহারা কলিকাতায় ঔষধাদির জন্য টেলিগ্রাম করিয়া যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

কিছুতেই কিছু হইল না। স্বামী আর চক্ষু মেলিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি এই কৃতঘ্ন পাপিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া শচীকান্তের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছিত হইয়া আমি ছয় দিন ছিলাম। ক্রমে শচীকান্তের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। ক্রমে আবার সব কথা ভাবিবার শক্তি হইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাস আমি মজঃফরপুরে ছিলাম। শচীকান্ত সঙ্গে ছিল; সে তাহার সমস্ত জীবন আমার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যে প্রেমের বীজ আমি তাহার হৃদয়ে নিজ হাতে বপন করিয়াছিলাম, তাহা পত্রে-পুষ্পে সুন্দর হইয়া তাহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

এত বড় পাপিষ্ঠা আমি যে, তখনো আমার হৃদয় হইতে তাহার লালসা দূর হয় নাই। আমি তখনও তাহার কথায় তৃপ্ত, তাহার দর্শনে পুলকিত এবং তাহার কদাচিৎ স্পর্শে মুগ্ধ হইতাম। চাবুক মারিয়া আমি মনকে ফিরাইতাম, কিন্তু ফিরাইতে বেদনায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত।

আমি নিজেকে কষ্টে সংযত করিতাম, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কোনও আঘাত দিতে পারিতাম না। সে যদিও কোনও দিন একটি কথা বলে নাই, তবু তাহার হৃদয় পরতে পরতে আমার নিকট খোলা হইয়া গিয়াছিল। তাই কিসে

তাহার আকাঙ্ক্ষা, কোথায় তাহার বেদনা, তা' আমি না বলিলেও বুঝিতে পারিতাম। তাই আমি তাহাকে নিরাশ করিতে—তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারিতাম না। সে যখন আমার কাছে আসিয়া বসিত, তাহাকে ফিরাইতে পারিতাম না; আমার মুখের কথা শুনিয়া সে কৃতার্থ হইত, তাহাতে আমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতাম না; আমার সেবায় সে সুখ পাইত, সে সেবা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা আমার অসাধ্য ছিল। তাই মনের সঙ্গে যতই কেন যুদ্ধ করি না, তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া পারিতাম না।

ছয় মাস পরে আমার স্বামীর জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আসিয়া পৌছিল। শচীকান্তই চেষ্টা করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া দিয়াছিল; চেকখানা আসিতেই একটু কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহা আমার নিকট দিয়া গেল। আমার বুক ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, চেকখানা হাতে করিতে আমার যেন সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল—সে যে আমার স্বামীর রক্ত—আমার বঞ্চনালব্ধ কলঙ্কের যৌতুক! এই কথাটাই বার বার আমার বুকের ভিতর আঘাত করিতে লাগিল যে, আমি আমার স্বামীকে আজীবন কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি! আমি তাঁহাকে ভালবাসি নাই, ভালবাসার ভান করিয়াছি; আমার ঝুঁটা মুক্তা দিয়া তাঁর হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ্ ঠকাইয়া

লইয়াছি। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার সেই জীবন-ব্যাপী বঞ্চনার শেষ উপার্জ্জন!

শচীকান্ত আমার কাছে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। তা'র চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম—তা'র মনের কথা। তা'র প্রাণ চাহিতেছিল আমাকে—বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তা'র অসীম প্রীতি দিয়া আমার দুঃখ নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া দিতে। তার বুকভরা ভালবাসা লইয়া সে আমার দুয়ারে আসিয়াছে—আমাকে শুধু দান করিয়া যাইতে। মুহূর্ত্তের জন্য এই চিন্তায় আমার মনে যেন একটা চরিতার্থতার ছায়া পড়িল! কিন্তু সেই চেকখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ আমার কর্ত্তব্য স্পষ্ট হইয়া চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল। কে যেন আমার ভিতর বলিয়া উঠিল—"ছি, আবার ঠকামি!" আমার স্বামীকে আমি যে নিদারুণ প্রবঞ্চনা করিয়াছি, আমার মনে হইল যেন, এই যুবককেও আমার সেই পৈশাচিক বঞ্চনার আবর্ত্তে ফেলিতে বসিয়াছি। আমি বলিলাম, "আর না, আজ এ বঞ্চনা শেষ করিয়া দিতে হইবে।"

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, "শচীকান্ত! তুমি আমাকে ভালবাস?" শচীকান্তের সমস্ত শরীর হঠাৎ একবার কাঁপিয়া উঠিল, সে একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল, পর-মুহূর্ত্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হ'য়েছে যে, শত চেষ্টা সত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না ক'রে পারিনি। কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে, আমি জেনেছি যে, আমি নিজেকে ঠকিয়েছি; তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছি; তোমার দাদাকে আমি আজীবন ঠকিয়ে এসেছি; যখন তাঁর চোখ ফুটলো, তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, কি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সর্ব্বস্ব আমি ঠকিয়ে নিয়েছি, তখন আর তাঁর শরীর তাঁকে বহন করতে পারলে না; সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি এই পাপিষ্ঠাকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে স্বর্গে গেলেন। এত বড় মহাপুরুষকে খেয়েও যদি আমার ক্ষুধা না মেটে, আবার তোমাকে যদি আমি আমার বঞ্চনার আবর্ত্তে ডুবাই, তবে বল্‌তে হবে যে, আমি দুনিয়ার সেরা পিশাচী। আমি তা পারবো না। তুমি আমাকে ত্যাগ কর। তোমাকে দেখ্‌লে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমাকে ভুলে যাও। আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, আমার কথা রাখ্‌বে?"

শচীকান্ত দাঁতে নখ কাটিতেছিল; তার মুখের প্রত্যেক শিরা উপশিরা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে নিপুণ ভাস্করের খোদাই-করা বেদনার একখানি মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি একবার মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিলাম। তার পর উঠিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, "বল, আমার কথা রাখ্‌বে ?"

এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আচ্ছা, তোমার কথাই থাক্‌বে।"

সে চলিয়া গেল। আমি সেইখানে মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিলাম ; বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে দুঃখ আমি কাহাকে জানাইব ? দুঃখীর আশ্রয়, তার চিরদিনের শান্তিদাতা ভগবান্, তাঁর কাছে আমি আমার এ দুঃখ কোন্ লজ্জায় জানাইব ? তাই কেবল বুক চাপিয়া মাটীতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলাম।

তার পর আর তাকে দেখি নাই। সে কেবল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল ; তাহাতে বলিয়াছিল যে, আমার চোখের সাম্‌নে সে দেখা দিবে না, কিন্তু এত দিন সে যেমন নীরবে প্রত্যক্ষ প্রেম-প্রতিমার গোপন পূজা করিয়া আসিয়াছে, চিরদিন সে তেমনি করিবে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ সে রাখিতে পারিবে না।

সে চিঠির উত্তর আমি দেই নাই, কিন্তু অনেক দিন সে চিঠিখানা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম। শেষে ভাবিলাম, চিঠিখানি রাখিয়া, যে রত্নে আমার অধিকার নাই, তাহা চুরি করিতেছি। তাই তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছি।

আজ পর্য্যন্ত আমি শচীকান্তকে ভুলিতে পারি নাই। আজও তার স্মৃতি আমার বৃদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলে। অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী রহিয়া গিয়াছি।

প্রথম কিছুদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহাতে আমার কোনও ক্লেশ হয় না। পরে ভাবিলাম, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া বাহিরে একটা মিথ্যা ক্লেশহীন কষ্টের আড়ম্বর রাখিয়া লোকের প্রশংসা বা সম্মান ঠকাইয়া লইবার আমার কোনও অধিকার নাই। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আমার পাপের বোঝা কমাইয়া, আমার শাস্তি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? যে পাপিষ্ঠা আমি, অনন্ত নরক আমার যোগ্য। ব্রহ্মচর্য্যে সে যন্ত্রণা তিলমাত্র কমে, এমন ইচ্ছা আমি করিতে পারি না।

*　　*　　*　　*

ঠানদিদি থামিলেন, দেখিলেন, আমার চোখে জল। বলিলেন, "চোখের জলের এমন অপব্যয় করিস্ না বোন্! আমার মত পাপিষ্ঠাকে ঘৃণা করতে শেখ্। লোকে যদি আমায় ঘৃণা করে, আমি তা'তে তৃপ্তি লাভ করি। লোকের সম্মানে বা স্নেহে আমার আতঙ্ক হয়, মনে হয়, সারা জীবন কি কেবল ঠকামিই করিব? আমার যাহা প্রাপ্য নয়, তা কি আমি কেবলি লোকের কাছে ঠকাইয়া লইব?"

ঝি—

১

প্রভাতে সূর্য্যোদয় দর্শন আমার অদৃষ্টে লেখা নাই। আমার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেশ বেলা হইয়াছে।

ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিলাম বাহিরে গৃহিণী কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। বুঝিলাম ঝি নিযুক্ত করা হইতেছে। আমি চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বারান্দায় গেলাম। বারান্দার অপর সীমায় সিঁড়ি। গৃহিণী (গিন্নী বলিলে তিনি বড় চটেন, কেন না তাঁর বয়স তখনও কুড়ি পার হয় নাই, এবং তিনি সন্ত বাড়ীতে বধূত্ব ছাড়িয়া আসিয়া আমার কলিকাতার বাসায় গৃহিণী হইয়া বসিয়াছেন)—গৃহিণী তখন বলিতেছেন "মাইনে নেবে কত ?"

যাহাদের সঙ্গে কথা হইতেছিল তা'দের একটির বেশ বয়স হইয়াছে ; চিনিলাম, সে পাশের বাড়ীর ঝি। দ্বিতীয়ার বয়স গৃহিণীর চেয়ে বড় বেশী হইবে না। তাহার চেহারা শান্ত সৌম্য ভদ্রঘরের মেয়ের মত। একদৃষ্টিতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে তাহাকে বেশ সুন্দরীই মনে হইল।

গৃহিণীর কথায় এই ব্যক্তির চোখ মুখ যেন অন্ধকার হইয়া উঠিল, চোখদু'টো যেন একটু ছল ছল করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল যে মাইনার কথাটা এ বেচারীর অনেক গুপ্ত বেদনায় আঘাত করিয়াছে। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রহিল না যে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করা ইহার এই প্রথম।

সঙ্গিনী—পাশের বাড়ীর ঝি—তাহার হইয়া বলিল, "মাইনে মা, সবাই যা পায় তাই দেবেন, তা'র চেয়ে কি আর বেশী হ'বে। এই সাড়ে তিন টাকা, ছ'খানা কাপড় তিনখানা গামছা।"

গৃহিণী কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাই হ'বে, ওই ঠিক ক'রে দাও।"

গৃহিণী, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার গৃহিণীপণার উপর আমার এ অনর্থক হস্তক্ষেপের সঙ্গে প্রস্তাবিত দাসীর রূপ-যৌবনের যে একটা সম্পর্ক আছে তাহা অনুমান করিয়া এ অভিযোগ ও অভিমান। আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলাম, বুঝিয়া কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই মনে হইল যে আমার সঙ্কুচিত হওয়াটা ভাল হয় নাই, ইহাতে গৃহিণীর সন্দেহটা বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া কিছুই হইল না। আমি নিজের উপর মহা-বিরক্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘরে ঢুকিয়া কাপড় চোপড় লইলাম। মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি বেড়াইতে বাহির হইলাম।

ঝি রহিয়া গেল।

বাহির হইয়া কেবল আজকার সকালের ব্যাপার লইয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। এই যে আমি স্ত্রীর সঙ্গে আর কোনও কথা না বলিয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়িলাম, ইহাতেও যে আমার স্ত্রীর অন্যায় সন্দেহেরই প্রশ্রয় দিলাম সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। নিজের উপর ভারী রাগ হইল।

ইহার দুই দিন পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রী ভাঁড়ার গুছাইতেছেন, সেই ঘরে ঝি একটা ভারী বাক্স লইয়া টানাটানি করিতেছে। সে বাক্স টানিবার শক্তি তাহার নাই। আমি ঘরে ঢুকিলাম, স্থির করিয়াছিলাম যে ঝি সম্বন্ধে আমার ব্যবহারে বা কথায় বার্ত্তায় আর কোনও অস্বাভাবিকতা কিছুতেই আসিতে দিব না। আমি স্ত্রীকে হাসিয়া বলিলাম, "এ কি ব্যাপার! তুমি যে এ ঘর একেবারে ওলট্ পালট্ করে দিয়েছ!"

আমার কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী আমার দিকে চাহিয়াই একবার ঝির দিকে চাহিলেন। সে বেচারা তখন বাক্স ছাড়িয়া মাথার কাপড় টানিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার স্ত্রীর এ দৃষ্টির মধ্যেও যে বেশ একটু অর্থ ছিল, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু এড়াইল না। আমি কেমন একটু থতমত খাইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল যে

ভাঁড়ার ঘর অঞ্চলে আমার যাতায়াত বড় বেশী ছিল না। আমার স্ত্রী আমার হঠাৎ ভাঁড়ারে আসার সঙ্গে ঝির অস্তিত্ব সংযোগ করিয়া একটা গূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন তাহা বুঝিতে বেশী দেরী হইল না। এতটা বুঝিয়া আমার স্ত্রীর ওই দৃষ্টির নীরব অভিযোগের সম্মুখে সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল; আমি বেশ একটু বিব্রতভাবাপন্ন হইয়া পড়িলাম, আর সেই সন্দিগ্ধা নারী আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল।

আমি তখন যেটা করা খুব স্বাভাবিক এমনি একটা কাজ করা কিংবা এমনি একটা কথা বলার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু আমার মাথায় একেবারে সমস্ত বুদ্ধি যেন তালগোল পাকাইয়া উঠিয়াছিল, কিছু মনে আসিল না। অবশেষে হঠাৎ একটা খেয়ালের মাথায় একটু হাসির মত করিয়া ওষ্ঠাধর প্রসারিত করিয়া বলিলাম—(কিন্তু আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি যে আমার হাসিটা দেখিতে অনেকটা কান্নার মত হইয়াছিল)—আমি বলিলাম, "অত বড় বাক্স টানা কি মেয়ে মানুষের কাজ, কোথায় সরাতে হ'বে বল, আমি সরিয়ে দিচ্ছি।"

আমার স্ত্রী তাঁহার আয়ত বিষণ্ণ চক্ষু দু'টী আমার মুখের উপর ফিরাইয়া, চট্ করিয়া ঘুরাইয়া লইলেন, শুধু "এইখানে" বলিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। আমার আজ কি হইয়াছে—কেবলি হিতে বিপরীত করিতেছি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দারুণ শীতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া

উঠিল। তাড়াতাড়ি বাক্সটা যথাস্থানে সরাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িলাম।

ইহাতেও আমার শিক্ষা হইল না। তবু চেষ্টা করিতে লাগিলাম ঝির বিষয়ে অত্যন্ত সহজভাবে ব্যবহার করিয়া আমি স্ত্রীর সন্দেহ দূর করিব। একবার ভাবিলাম যে তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কহিয়া একটা এস্পার ওস্পার করিয়া দিই। কিন্তু কথা, ছাই, পাড়ি কি করিয়া? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম যে কথা আমি পাড়িলেই বেকুব বনিতে হইবে। ধর, যদি আমি স্ত্রীকে গিয়া বলি "তুমি আমাকে এই ঝির সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রছো!" তিনি তখনি গম্ভীরভাবে বলিবেন "কই না?" বস্ কথার শেষ হইয়া যাইবে, আরও আমি মাঝখান থেকে নিজের কথায় চোর বনিয়া যাইব। আর যদিই বা তিনি বলেন "কই, আমি কবে তোমায় এমন কথা ব'ল্‌তে গেলুম," তাহা হইলে তার পর আর ডু' একটা কথা বলা চলে কিন্তু আখেরে আমায় চুপ করিতেই হইবে। আর যদি তিনি মহাবিস্ময়ের ভান করিয়া অবাক্ হইয়া বসেন তবে তো আমি পলাইতে পথ পাইব না।

সুতরাং স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কহিবার আশা ছাড়িয়া দিলাম। বড় রাগ হইল আমার স্ত্রীর উপর। আজ সাত বছর হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এর মধ্যে তা'র মনে কি এতটুকু বিশ্বাসও জন্মায় নাই? ছি! আর যদি বা সন্দেহ

হয়ই, তবে পোড়ারমুখী মুখ ফুটিয়া বলে না কেন? সে যদি কথাটা একবার পাড়ে তবেই তো লেঠা চুকিয়া যায়।

সে সম্বন্ধে কথা উঠিলই না; কাজেই আমার নিজেকে সম্পূর্ণ সুধরাইয়া সহজ ব্যবহার দ্বারা আমার স্ত্রীর সন্দেহের অমূলকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তাই একদিন খুব চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব সহজভাবে স্ত্রীকে বলিলাম, "কি গো, তোমার ঝি কাজ ক'রছে কেমন?"

সহজ সুর কি ছাই হয়? আমায় যেন ভূতে পাইয়াছিল। সব সময় যেন মনে হইত যে আমার স্ত্রীর চোখ দু'টা আমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর সে চোখ যেন মনের তলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। যদিও মনের তলায় আমার কোনও কাদা ছিল না সে কথা হলপ করিয়া বলিতে পারি, তবু এমন একটা সদাসর্ব্বদা নজরবন্দী অবস্থায় কার না বাধ বাধ ঠেকে। ছেলেরা যেমন পরীক্ষার সময় পরীক্ষকের সামনে দাঁড়াইয়া খুব জানা কথাও ভুলিয়া যায় আমারও হইয়াছিল তাই। তা' ছাড়া, চেষ্টা করিয়া কি স্বাভাবিক হওয়া যায়? যতই কেন পাকা জুয়াচোর হও না তুমি, এ নকল স্বাভাবিকতার মেকী পাকা লোকের চোখে ধরা পড়িবেই। আর আমার স্ত্রী যে অন্ততঃ মেকী চিনিবার বিষয়ে পাকা লোক সে কথা আমি বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলাম।

তাই খুব স্বাভাবিকভাবে যে কথাটা বলিব মনে করিয়া-

ছিলাম তাহা বলিতে আমায় অনেকবার ঢোঁক গিলিতে হইয়াছিল, বুকের ভিতরটাও কেমন দুড় দুড় করিতেছিল।

আমার স্ত্রী সেলাই করিতেছিলেন, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া, পুনরায় ছুঁচ সূতায় চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া শুধু বলিলেন, "বেশ।"

বস্, ফুরাইয়া গেল। আর কথা জুয়ায় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, পায়ের তলায় একটু কাঁপুনি অনুভব করিলাম, জিভটা একটু শুকাইয়া আসিল, হায় আর বলি কি? ধপ করিয়া বলিয়া বসিলাম, "দেখ আমার বোধ হয় ওর এ কাজ এই নূতন, দুরবস্থায় পড়ে দাসীবৃত্তি ক'রছে, কিন্তু খাটবার শরীর ওর নয়। তুমি ওকে একটু সমঝে কাজকর্ম্ম দিও।"

কথাটা আমার মনের ভিতর সেই প্রথম দিন হইতে বরাবর জাগিতেছিল, তাই ভাল মন্দ না ভাবিয়া কথার অভাবে বিপন্ন হইয়া বলিয়া ফেলিলাম।

বলা শেষ না হইতেই আমার মন আমাকে চাবুক মারিতে লাগিল, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কথাগুলা বলিয়া শেষ করিলাম। আমার অপরাধ যে হাজার গুণ বাড়িয়া গেল তা' আমি বেশ ভালরূপই বুঝিলাম।

আমার স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা!!" এই কথাটা বলিয়া তিনি আমার উপর বেশ টেক্কা দিয়া গেলেন সে কথা আমি অন্তরের সহিত অনুভব করিলাম। আর

তিনিও যে বেশ একটু বিজয় গর্ব্বেরই সঙ্গে এ কথা বলিলেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। আমি প্রহৃত কুকুরের মত লাঙ্গুল গুটাইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম।

এমনি আমার স্বাভাবিকতার দিকে সব চেষ্টা একেবারে চুরমার হইয়া টিট্‌কারী দিয়া আমারই মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে বিরক্ত হইয়া স্থির করিলাম, আপদ্ বিদায় করিব। ঝিকে প্রথম দেখা অবধিই আমার মনে হইতেছিল যে এর ভিতর কি একটা গভীর বিষাদের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। তাই কতকটা কৌতূহলে এবং কতকটা তার অজানা বিষাদের প্রতি করুণায় আমার হৃদয় বিশেষভাবে তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ভগবান্ যখন এই বেদনাক্লিষ্ট তরুণ জীবন আমার হাতে পৌছাইয়া দিয়াছেন তখন আমার যতদূর সাধ্য তাহাকে সুখী করিব এই আকাঙ্ক্ষা আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আর তো পারা যায় না। পরের আপদ্ কুড়াইয়া নিজের কি শেষে সর্ব্বনাশ করিব? তাই স্থির করিলাম ইহাকে বিদায় করিব। বেচারা ঝির মলিন মুখখানা মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইল, কিন্তু বেশ ভাবিয়া দেখিলাম, অন্য উপায় নাই।

মন স্থির করিয়া আমি এক দিন সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর সন্ধানে গেলাম। তিনি তখন ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কুট্‌নো কুটিতেছেন। ঝি কাছে বসিয়া আছে। এ কাজ আগে সেই

করিত। ঘরে আলো জ্বলিতেছে কিন্তু বাহিরে তখন অন্ধকার।

আমি এ অবস্থায় আবার ভাঁড়ারে ঢুকিতে কুণ্ঠিত হইলাম। সেদিনকার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া যাইব কি না বিবেচনা করিতে লাগিলাম। স্ত্রী ঝিকে বলিলেন, "একবার রামধনীকে ডাক না বাছা, ওপর থেকে কাল তোরঙ্গটা নিয়ে আসুক।"

"আমিই নিয়ে আসি," বলিয়া ঝি উঠিল। স্ত্রী মানা করিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি যেয়ো না, তোমার ও কাজ নয়।" ঝি বসিয়া পড়িল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঝি বলিল, "আমি আপনার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি মা? এ ক'দিন থেকে আপনি আমায় কোনও কাজই ক'রতে দেন না, আমায় বসিয়ে রেখে নিজেই যদি কাজ ক'রবেন তবে আমায় মাইনে দেন কেন? দোষ ক'রে থাকি মা, আমি আপনার চাকর আমায় শাস্তি দিন, কিন্তু এমন ক'রে পায়ে ঠেলবেন না।"

ঝি চক্ষে অঞ্চল দিল। তা'র পর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বড় দুঃখী মা, আপনাদের কাছে এসে বড় সুখে আছি। আপনি যদি রাগ করেন তবে আমার কি উপায় হ'বে মা?"

"আপনাদের কাছে এসে বড় সুখে আছি"—এ

কথাটায় বোধ হয় বিশেষভাবে বহুবচন প্রয়োগে গৃহিণীর ভ্রূকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি সদয়ভাবেই বলিলেন, "না বাছা, রাগ কিসের? চিরদিন খেটে এসেছি, ব'সে থাকতে ভাল লাগে না। এতে আবার কান্না কিসের বাছা?" বলিয়া আমার স্ত্রী উঠিয়া ঘরের অপর পার্শ্বে গিয়া আমার দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন। ঝির কথা শুনিয়া আমার মনে নানা কথার আলোচনা হইতেছিল, চক্ষুও যেন একটু ভিজিয়া উঠিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, কি রহস্য এই নারীর জীবনে আছে? সে কি পাপ? বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তাহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে এমন কোনও কথা আমার মনে হইল না। বরং তার বিরুদ্ধে অনেক কথাই মনে হইল। সে আমার বাড়ীতেই রাত্রিদিন থাকে, রাস্তায় কখনও বাহির হয় না। বাড়ীর চাকর বাকরের সঙ্গেও আবশ্যকের অতিরিক্ত একটি কথাও কয় না। আর তা'র এমন একটা ব্রীড়াময় সঙ্কুচিত ভাব আছে, যাকে পাপিনীর ভান বলিয়া মোটেই মনে হয় না। তবে কি? কোন দুঃখ তাহাকে এ তরুণ বয়সে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিতে পাঠাইয়াছে। মনে হইল, ঝির সধবার লক্ষণ, লোহা, শাঁখা ও সিন্দুর আছে; তাহার স্বামী তবে জীবিত। তা যদি হয়, তবে সে কেন ইহার সন্ধান লয় না। এই কথায় একবার সন্দেহ হইল, হয়ত বা এ কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যদি তাই হয়,

তবে তাহার ভিতর কোনও একটা অতি নিদারুণ প্রবঞ্চনা, অতি করুণ পদস্খলনের কাহিনী—

এ হঠাৎ এ কি! সম্মুখে গৃহিণী! তিনি ঘরের যে দিকে গিয়াছিলেন, সে দিক্ আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না। সেই দিক্ হইতে তিনি একেবারে বাহির হইয়া আসিয়াছেন! একেবারে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইতে তবে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তার একটু পাশেই আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, যে কেহ সে অবস্থায় আমাকে দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, আমি আড়াল হইতে অলক্ষিতে ঝিকে দেখিতেছিলাম।

গৃহিণীকে দেখিয়াই আমার মাথা হইতে পা পর্যান্ত কাঁপিয়া উঠিল। তখনকার উন্মত্ত কল্পনায় ভাবিলাম, যে ঠিক যেন এই আসিয়াছি এমনি ভাব করিয়া চলিয়া গেলে গৃহিণী কিছু টের পাইবেন না। তাই করিলাম, পরে বুঝিতে পারিলাম যে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা করিতে পারি নাই, আমি মুখ ফিরাইয়া রীতিমত বৈঠকখানার দিকে, যাহাকে বলে চম্পট, তাহাই দিয়াছিলাম।

২

বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া আমি ধপ্‌ করিয়া একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। খুব দ্রুতভাবে সমস্ত অবস্থা ও আনুষঙ্গিক নানা কথার একটা আলোচনা করিয়া গেলাম; কি করা যায়, কি করিলে কি হয় ভাবিতে লাগিলাম।

স্ত্রীর কাছে গিয়া ঝিকে বিদায় করিবার মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করাটা এখন যা'কে ইংরাজরা বলে "প্রশ্নের বহির্ভূত।" অথচ পাপ বিদায় না করিলেও নয়! করি কি? পাশের বাড়ীর ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিব? অমনি মনে হইল যে সে ঝিকে যদি আমার স্ত্রী আমার ঘরের দিকে আসিতে দেখেন, এবং তা'র পরেই যদি আবার সে আসিয়া আমাদের ঝিকে লইয়া যায় তাহা হইলে গৃহিণী Evidence Actএর প্রত্যেক ধারা অনুসারে ইহা সাব্যস্ত করিতে পারেন যে আমি ঝিকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া অন্যত্র তাহার কোনও অসঙ্গত বন্দোবস্ত করিয়াছি, এবং তিনি তাহা যে সাব্যস্ত করিবেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। অতএব করি কি? ঝিকে যদি আমার ঘরে ডাকিয়া পাঠাই তবে তো আমার আর ওজুহাত দিবার অবসর থাকিবে না। স্ত্রীকে না

বলিয়া নিজেই বা আমি কি ওজুহাতে তাহাকে জবাব দিবার ভার লই ?

আর জবাব যে দিব বেচারা যাইবে কোথায় ? কি আমার স্ত্রীকে যে কথাগুলা বলিতেছিল তাহা মনে পড়িল, তা'র চক্ষের জল মনে পড়িল, তা'র জীবনের বিষাদময় রহস্যের কথা মনে পড়িল। কত দুঃখ হইল।

আকাশ পাতাল এমনি ভাবিতেছি এমন সময় আমার ব্যারিষ্টার বাবু অতুল ঘরে ঢুকিল।

"Hallo ! what a long face ! তুমি কি ভূত দেখেছ নাকি ? আমি ভূত নই। কি ? হয়েছে কি ?" বলিয়া সে আমাকে সম্ভাষণ করিল।

আমি বলিলাম, "তুমি ব্যাচেলর মানুষ আমাদের সংসারী লোকের ভাবনা চিন্তা কি বুঝবে ?"

অতুল বলিল, "দেখ, তোমাদের অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষদের একটা ভয়ানক inconsistency আছে। In season and out of season তোমরা আমাদের বল বিয়ে ক'র্‌তে আর দাঁড় করাতে চাও যে বিয়ে করাটা খুব একটা গাঢ়রকম সুখের ব্যাপার। কিন্তু সদা সর্ব্বদাই দেখতে পাই একটা না একটা গণ্ডগোল তোমাদের লেগেই আছে। মুখখানা এমনি বই এমনি দেখবার জো'ই নেই।" বলিয়া সে বিষাদ ও হাসির ভঙ্গী করিল।

আমি বলিলাম, "তোমার কথা ঠিক। বিবাহে সুখ

আছে এ কথা অস্বীকার ক'রলে নেমকহারামী হ'বে, কিন্তু দুঃখের ভাগটা আমার এখন মনে হ'চ্ছে অত্যধিক।"

অতুল বলিল, "তোমার এখনকার দুঃখটা কি ?"

"আর ভাই বল কেন ? আমি একটা ঝি রেখেছি। সে সুন্দরী, রূপবতী, গুণবতী। একজন যুবকের ঘরের ঝির যত দোষ থাকতে পারে সবই তা'র আছে। এখন একদিকে এই ঝি আর একদিকে গিন্নী এই নিয়ে আমি মহা অশান্তিতে প'ড়েছি।" আমার দুরদৃষ্ট, তাই আমি বাকী কথা ইংরাজীতে বলিলাম, তাহাকে জানাইলাম যে আমার স্ত্রীর কি অন্যায় সন্দেহ !

অতুল বলিল, "তা' সে ঝিকে বিদেয় ক'রলেই পার !"

আমি বলিলাম, "তাই তো ভাবছি। কিন্তু সে innocent একান্ত আমার উপর তা'র নির্ভর। তা'কে একেবারে ভাসিয়ে দিতে মনে বড় কষ্ট হয়। তাই ভাবছিলাম যে তা'র কোনও ভাল ব্যবস্থা ক'রতে পারি কি না। I don't want to force her into a life of shame. সে যে খারাপ নয় তা আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি।"

ইংরাজী যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, তাহার জন্য অতি সত্বরই আমায় অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।

আমি আরও বলিলাম, "যদি কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ী তা'কে রাখতে পারতাম—"

"তা বেশ তো! আমার ওখানে দাও না। আমার পিসিমা আমার সঙ্গে আছেন, তাঁকে নিয়ে বড় বিপদেই পড়তে হয় আমার। তুমি যেমন ব'লছো তা'তে এ ঝি হ'লে তাঁর আর দুঃখ থাকবে না।"

"তা নিশ্চয়! কিন্তু ঠিক বল ভাই, তোমার হাতে ভরসা ক'রে তাকে দিতে পারি ত? তুমি একে young তা'তে bachelor."

"তাতে তোমার কিছু ভয় নেই। আমি vaccinated."

"তা'তে কি? টীকে নেওয়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ তা' বুঝতে পারলাম না।"

"এ বুঝলে না! ভালবাসা একটা ব্যাধি। কিন্তু যেমন বসন্তের টীকা হলে আর বসন্ত হয় না, তেমনি যে প্রেমে একবার ভাল ক'রে প'ড়েছে, তার এই ব্যাধির প্রতিষেধক টীকা হ'য়ে যায়।"

"তুমি কি প্রেমে প'ড়েছিলে নাকি? বেশ বেশ, তোমার প্রেম-কাহিনীটা, নিশ্চয় শোনবার মত জিনিস! বিয়োগান্ত হ'ল কেন বল দিকি নি?"

অতুল গম্ভীর হইল। বলিল, "সে বড় করুণ-কাহিনী। আমার মনের ভিতর যে কত বড় বোঝা চেপে আছে তা আমার হাসি তামাসা শুনে কেউ কখনো কল্পনাও করে না। কোনও দিন কাউকে সে কথা বলি নি, কিন্তু আজ মনে হ'চ্ছে তোমাকে

বলি। কিন্তু see first that there's nobody listening."

আমি উঠিলাম। আমার বাড়ী ছোট। যে ঘরটা আমি বৈঠকখানা করিয়াছিলাম, ভিতরের দিকে তার দুইটি দরজা ছিল। একটি ছিল ভাঁড়ারের দিকে, সেটা বন্ধই থাকিত, আর একটি ভিতরের বারান্দার দিকে। বারান্দার দিকে একটা জানালাও ছিল। আমি বারান্দার দরজার কাছেই বসিয়াছিলাম, উঠিয়া বারান্দার বাহির হইতেই দেখি—সর্ব্বনাশ! আমার স্ত্রী জানালায় কান পাতিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। একটু শব্দ হইতেই দরজার দিকে না ফিরিয়াই ছুটিয়া উপরে গেলেন। আমার শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অত্যন্ত দ্রুততার সহিত আমি অতুলের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, মনে মনে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া ফেলিলাম। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমার স্ত্রী ইংরাজী মোটে জানিতেন না। জানিলে তিনি অতুলের শেষ কথাটা শুনিয়াই সরিয়া দাঁড়াইতেন, আমার কাছে ধরা পড়িতেন না। আমার ইংরাজী কথাগুলি বাদ দিয়া ধরিলে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার যে অত্যন্ত কদর্থ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

কলের পুতুলের মত আমি একবার ভাঁড়ারের দরজা দেখিতে গেলাম, সেখানে দেখিলাম ঝি সবে দুয়ার হইতে

মুখ সরাইয়া প্রস্থান করিতেছে! ভাবিলাম, এর মানে কি? ঝি কি আমাকে লুকাইয়া দেখিতেছিল? কেন? সে কি মরিয়াছে! মনটা বড় দমিয়া গেল।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া অতুলকে এ কথা বলিলাম না; সে তাহার কাহিনী বলিয়া গেল।

৩

অতুলের কথা।

আমি ভালবেসেছিলাম—এখনো সে ভালবাসা মনের মধ্যে সমান র'য়ে গেছে, কিন্তু সে ভালবাসার পাত্রী নাই, থাকলেও তা'কে জানাবার আমার অধিকার নাই। আমার ভালবাসার ইতিহাস একটা ট্রাজেডী।

ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীটা দেখেছ। তার পিছনে এখন একটা পার্ক হ'য়েছে। সেখানে আমাদের খিড়কী পুকুর ও বাগান ছিল, তা'র ও ধারে গোলপাতার ঘরওয়ালা একখানা ছোট বাড়ী ছিল। চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বিধবা স্ত্রী একটি ছোট মেয়ে নিয়ে ওইখানে আশ্রয় নেন—বাড়ীটা আমাদেরই ছিল, বাবা দয়া ক'রে বিধবাকে দিয়েছিলেন।

সে মেয়েটি যে কি চমৎকার দেখতে ছিল তা' কি ব'লবো। সে আমার চেয়ে বছর ৩।৪এর ছোট হ'বে। ছেলেবেলায় আমি তাকে কোলে কাঁখে করে বেড়িয়েছি আর খেলা দিয়েছি। আর একটু বড় হতেই—হয় তো যখন আমার ১৪।১৫ বছরের বেশী বয়স হ'বে না তখন থেকেই—আমি তাকে ভালবেসেছি। ছেলে মানুষের সে 'লভে' পড়া, এখন মনে হ'লে হাসি পায়, কিন্তু আমি এখনও ব'লতে পারি যে সেটা ছিল খাঁটি প্রেম।

মেয়েটির নাম ছিল কমলা। তার দশ বছর বয়স হ'তেই তার মা ছুটোছুটি ক'রতে লাগলেন তা'র বিয়ের জন্য। আমাদের বাড়ীতেই তা'র বিয়ের কত কথাবার্ত্তা হ'য়েছে। আমি সে সব কথা তন্ন তন্ন ক'রে শুনতাম, প্রত্যেকটা কথায় যেন আমার গায়ে কাঁটা বিঁধতো। আমার মা ছিলেন না। বাবা কমলার বিয়ের সব খরচ দিবেন ব'লেছিলেন—এতটা দয়া ক'র্‌তে পারলেন আর দয়া ক'রে আমার সঙ্গে তা'র বিয়ের প্রস্তাবটা ক'রতে পারলেন না।

মেয়ে বেড়ে চললো কিন্তু বিয়ের কিছুই হ'ল না। আমার বোধ হয়, তার মার নামে একটা কিছু অপবাদ ছিল তাতেই অনেকে সুন্দর মেয়ে দেখে এগিয়ে শেষে পিছ পা' হ'য়ে যেত। যা'ক, মেয়ে বাড়তে লাগলো আমি যেবার বি-এ, দেব তখন কমলা সতেরোয় পা দিয়েছে। তার রূপযৌবন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছে। তা'র দিকে চাইলে আমার তখন জ্ঞান থাকতো না। কিন্তু আমি খুব লাজুক ব'লে—হাসছো বটে, কিন্তু আমি অন্ততঃ তখন খুব লাজুক ছিলাম—খুব লাজুক ব'লে আমি কোনও হঠকারিতা ক'রে বসি নি। আর তা' ছাড়া দাদার তখনও বিয়ে হয় নি, বিয়ে দেবার নামটিও বাবা করেন নি, আমি কাজেই চুপ ক'রে না থেকে করি কি?

সেই বছর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন তা জান। বাবা মারা

যাওয়ার পর বিধবা কেঁদে আকুল। আমাদেরই পাড়ার চঞ্চল ব'লে একটি ছেলে—লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখে নি, জমা বাড়ীর দালালী ক'রবার চেষ্টা ক'রছে—তার সঙ্গে কমলার বিয়ের কথা প্রায় ঠিকঠাক। তিন হাজার টাকা খরচ হ'বে তা' বাবা দিতে স্বীকার ছিলেন। হঠাৎ বাবা মারা যেতে বিধবা ভাবলে বুঝি সব ফেঁসে গেল, সে দাদার কাছে এসে কেঁদে প'ড়লো। দাদা বল্লেন "আপনি চিন্তা ক'রবেন না, টাকা আমি দেব। আপনি সম্বন্ধ স্থির করুন।"

কিন্তু চঞ্চলের বাপ, কি জানি কেমন হঠাৎ বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন, একটা ওজুহাত দিলেন যে কাশীর কোন পণ্ডিত কোষ্ঠী দেখে ব'লেছেন যে এ বিয়ে হ'তে পারে না। আমার বিশ্বাস কথাটা ভুয়ো। কেন না কোষ্ঠী এর আগে খুব ভাল পণ্ডিত দিয়েই দেখান হ'য়েছিল। যাই হ'ক, এ বিয়ে ভেঙ্গে যেতে আমি খুসীই হ'লাম, এখন ঘাড়ে পড়া গোছ চেহারা করে কমলাকে আমার বিয়ে ক'রতে বাধা হ'বে না। কিন্তু পথে কাঁটা দাদা! তার তখনো বিয়ের নামটিও নেই।

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম যে দাদার সঙ্গে কমলার বিয়ে! আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লো। "ঘাটে এসে ডুবিল তরণী"। শুনলাম, চঞ্চলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যেতে কমলার মাকে দাদা আশ্বস্ত ক'রে বললেন, আমিই আপনার মেয়েকে বিয়ে

ক'রবো। এমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে এর বিয়ের আবার ভাবনা।" বিধবা অবাক্ হইয়া রইল—এ তা'র স্বপ্নের অগোচর! তার পর সে দাদাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গেল।

আমার মনে হ'ল দাদার এটা ভারি অন্যায়! অন্যায়টা ঠিক কোন খানে তা' না বুঝলেও আমি ঠিক ক'রলাম তাঁর এমন দয়া ক'রবার কোনও দরকার ছিল না। তিনি দয়া ক'রে যাকে উদ্ধার ক'রছেন আমি যে তাকেই বিয়ে ক'রবার জন্যে ছট্‌ফটিয়ে মরছি এটা কোনও অজ্ঞাত উপায়ে তা'র জানা উচিত ছিল। তা' ছাড়া আমার সন্দেহ ছিল না, এবং এখনো নেই, যে কমলা আমাকে সত্যি-সত্যি ভালবাসতো। যদিও তা'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোনও কথাই হয় নি, কিন্তু আমি যে তার চোখ দু'টোর ভিতর আমার উপর অসীম প্রেম কতবার দেখেছি তা ব'লতে পারি না।

আমার একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা হ'ল এ বিবাহ বারণ ক'রবার। দাদা তো আর বাবা নয়, তার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করা যেতে পারবে। কিন্তু, তা'র আগে কমলার মন জানা চাই। আমি ছুটলুম কমলাদের কুঁড়ের দিকে।

সেদিন সবে আমাদের কালাশৌচ গিয়েছে। তা'র সপ্তাহখানেক পরেই বিয়ের দিন ঠিক হ'য়েছে। কমলার

মা বার বার আমাদের বাড়ী ছুটাছুটি ক'রে দাদার সঙ্গে বিয়ের এটা-ওটা স্থির ক'রে বিয়ের লক্ষ কথার পূরণ ক'রছেন। তাই আমি যখন গেলাম তখন কমলা বাড়ীতে একা। ঘরের দাওয়ায় একটা তক্তপোষ প'ড়ে থাকতো, তার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার মন তাই দেখে দাদার উপর বিষম চটে' গেল, যদিও এখন ভেবে দেখ্‌তে গেলে দাদার—তখন পর্য্যন্ত—কিছুই দোষ দেখ্‌তে পাই না। আমার ইচ্ছা হ'ল তাকে বুকে জাপটে ধ'রে বলি, কেঁদ না, তুমি আমারই হ'বে— দাদার নয়।

আমি ডাকলাম, "কমলা !"

সে অমনি মুখ তুলে চাইল, সে কি রূপ—বিষাদভরা রাঙ্গা মুখখানি, কুচকুচে কাল চুল অযত্নে তার মুখের উপর এসে প'ড়েছে ! চোখ দু'টো জলে ভরে লাল হ'য়ে ঠিক যেন পদ্মের পাপড়ির মত ফুটে র'য়েছে !

আমি বলিলাম, "কেঁদ না কমলা, তোমার এ বিয়েতে যদি অমত থাকে তবে আমি দাদাকে ব'লে বিয়ে ফেরাব।"

সে যেন একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। আমি ব'ললাম, "তুমি আগে সত্যি করে শুধু বল তুমি আমাকে ভালবাস কি না ?"

সে কথা কি ব'লবে। দু' চোখ তা'র জলে ভ'রে উঠলো, সে মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলো। আমি বুঝলাম সে আমায় কত ভালবাসে। বল্লাম, "তুমি

নিশ্চিন্ত থাক, দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'বে না। কেঁদ না লক্ষ্মীটি।"

সে তখন ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত তার আয়ত চক্ষু আমার মুখের দিকে ফিরিয়ে ব্যাকুলভাবে শুধু বল্লে, "তোমার পায়ে পড়ি, তোমার দাদাকে কিছু ব'লো না।" ব'লে কেবলি কাঁদতে লাগলো।

আমি বড় বিপদে প'ড়লাম। নানা রকম ভাবনা আমাকে বিব্রত ক'রে তুল্‌লো। দাদাকে যে তা'র ভালবাসার কথা আর তার কান্নার কথা ব'লতে বারণ ক'রলে সেটা ভালই তা' আমি বুঝলাম, কিন্তু তা' যদি না করি তবে বিয়ে থামে কিসে?

ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে গেলাম। কিছুই স্থির ক'রতে পারলাম না। দিন দুই পরে কথাটা বলবো ব'লে স্থির ক'রে আমি দাদার কাছে গেলাম। গিয়ে একথা-ওকথা ব'লে আমতা আমতা ক'রে বলে ফেল্লাম, "দেখ দাদা, বিয়ে তো ক'রছো, কিন্তু—এই—কমলা—বড় মেয়ে—এই,—তা'র মতটা—একবার জিজ্ঞাসা—"

দাদাকে দেখিলাম একেবারে বিয়ের আনন্দে মশগুল, আমার এ কথাটায় তাঁর মুখে যেন একটা কিসের ছায়া প'ড়লো। তাতেই আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম। দাদা আমাকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "কেন রে? তার কি বিয়েতে অমত আছে?" ব'লে একটু হাসলেন।

আমি বল্লাম, "না তা নয়, তবে এই বড় মেয়ে কি না, তাই ব'লছিলাম।" তখন আমি পালাতে পারলে বাঁচি। নানা কথার মধ্যে আমার একটা সন্দেহ মনে হ'য়ে আমার মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিলে। ভাবলাম যে আমার মত দাদাও তো কমলাকে ভালবেসে থাকতে পারে! সেও হয় তো আমারই মত মুখটি চেপে ব'সে ছিল এত দিন। তার মুখে আনন্দের ফোয়ারা দেখে আমার কেবলি মনে হ'চ্ছিল যে আমার সন্দেহ ঠিক। তাই আর বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে আমি একটা অছিলা ক'রে উঠে গেলাম।

আমি দেখলাম, আমি কিছুই ক'রতে পারি না। কমলা আমাকে ভালবাসে, দাদাকে ভালবাসে না; কিন্তু আমি যদি স'রে পড়ি তবে সে হয় তো দাদাকেই ভালবাসবে আর সুখী হ'বে। সুতরাং স'রে পড়াই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে সেই দিনই গিয়ে বিলেত যাবার passage engage ক'রে এলাম। বিয়ের পর দিনই যাব স্থির ক'রলাম, হঠাৎ বিয়ের দিনটা তিন দিন পেছিয়ে গেল ব'লে বিয়ের দু'দিন আগেই আমি বিলাত যাত্রা ক'রলাম। ওজুহাত, সিভিল সার্ভিস এবং ব্যারিষ্টারি পড়া, কিন্তু মনে মনে আমার সংকল্প ছিল যে ভারতবর্ষে আর ফিরবো না।

বিলেত গিয়ে বছর খানেক পরেই আমাদের Solicitorএর কাছে টেলিগ্রাম পেলাম, দাদা আমার নামে সর্ব্বস্ব দান ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন। আমি কিছুই

বুঝতে পারলাম না। ছুটে ফিরে এলাম। এসে শুনলুম যে দাদা নাকি কমলাকে একদিন রাত্রে বাড়ী থেকে রাস্তায়—literally রাস্তায় বের—ক'রে দিয়ে পরের দিন সম্পত্তির দানপত্র ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন। দাদা ও কমলার অনেক খোঁজ ক'রলাম, কোনও সন্ধান পেলাম না। তা'র পর আর দেশে থাকতে মন সরলো না। বিলেতে ফিরে গেলাম। দু'বছর পরে পাশ ক'রে আবার ফিরে এলাম।

অতুল চুপ করিল। কিছুক্ষণ বাদে বলিয়া উঠিল, "The brute! তা'র কমলাকে বিয়ে ক'রবার কোনও দরকার ছিল না! বানরের গলায় সে মুক্তাহার হ'য়েছিল। আমার ঠিক বিশ্বাস যে দাদা যেমন ঝোঁকা মানুষ তা'তে যেমন ঝোঁকের মাথায় বিয়ে ক'রেছিলেন, তেমনি বিয়ের পর যখন দেখলেন যে কমলা তাঁকে ভালবাসে না, তখন ঝোঁকের মাথায় রাতারাতি তাকে পথে বের ক'রে দিলেন। কমলার যে কোনও দোষ নাই তা' আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি।"

৪

অতুলের সঙ্গে তার পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। স্থির হইল ঝি অতুলের বাসায়ই যাইবে, অবশ্য সে যদি ইচ্ছা করে। খানিক বাদে অতুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ ভাই, বৌদিদির সন্দেহের কোনও ভিত্তি নাই তো? ঠিক বুঝে বল।"

আমি বলিলাম, "আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই নয়, তবে"—

"তবে কি" অতুল ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

"আমার এখন একটু সন্দেহ হচ্ছে যে ঝিটা যেন মজেছে; আর এখন মনে হ'চ্ছে যে আমার স্ত্রী হয় তো ওই মাগীর রকম সকমে কথাবা-বার্ত্তায় কোনও ইঙ্গিত পেয়েই বোধ হয় আমাকে আরও বেশী ক'রে সন্দেহ ক'রছেন।"

"Here's a pretty kettle of fish আ'লটা তবে বেশ রীতিমতভাবেই বেঁধেছে। আমি বলি তুমি অবিলম্বে এর প্রতিবিধান কর, আজই বৌদিদির সঙ্গে কথাটা সাফ ক'রে ফেল, কাল সকালে ও ছুঁড়ীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেও।"

আমি বলিলাম, "আমি তো এখনি তাকে বিদায় ক'রতে পারলে বাঁচি।"

অতুল চলিয়া গেল রাত্রি ন'টার পর। তখন উপরে যাইয়া গৃহিণীর সামনা-সামনি দাঁড়াইবার কল্পনায় আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তার সামনে গিয়া কথাটা পাড়ার তো কথাই নাই। কি করি তাই ভাবিতে লাগিলাম, ভাবনার আর কোনও সীমা পাইলাম না।

বাহ্যজগতের সঙ্গে আমার তখন কোনও সম্পর্কই ছিল না। টেবিলের ওপর একটা দোয়াত লইয়া আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে নাড়িতেছিলাম। একটা বেড়াল ঘরের ভিতর আসিয়া, বমি করিবার মত করিতেছিল আমি অন্যমনস্কভাবেই দোয়াতটা ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিতে গেলাম, সমস্ত কালিটা আমার ধপ্‌ধপে সাদা পাঞ্জাবী ও ধুতির উপর পড়িয়া গেল। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল।

তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি উপরে গেলাম সেখানে অন্যান্য ঔষধ পত্রের সঙ্গে আলমারীতে খানিকটা Oxalic acid ছিল, তাই দিয়া জামা কাপড় ধুইব ইচ্ছা ছিল। দেখিলাম গৃহিণী শুইয়া আছেন, তাঁহার হাতে "কৃষ্ণকান্তের উইল।" এই বইখানার উপর আমি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলাম। কারণ খৃষ্টানের যেমন বাইবেল, মুসলমানের যেমন কোরাণ, আর হিন্দুর যেমন— যে কোনও সংস্কৃত বই—তেমনি হইয়া উঠিয়াছিল আজকাল আমার স্ত্রীর কাছে এই "কৃষ্ণকান্তের উইল।" আমি এ কথা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতাম

না যে গৃহিণী গোবিন্দলালের ব্যবহারের সঙ্গে আমার ব্যবহার মিলাইয়া লইবার জন্যই সদাসর্ব্বদা এই বইখানা পড়িতেন।

আমি কোনও কথা না বলিয়া ওষুধের আলমারীর কাছে গিয়া অক্সালিক অ্যাসিড্ খুঁজিতে লাগিলাম। শিশিটা যেখানে থাকিবার কথা সেখানে ছিল না। তাই, পাইতে একটু দেরী হইল। পাইয়া দেখি শিশি শূন্য। আমি নিশ্চয় জানিতাম এ শিশি প্রায় ভরা ছিল, তাই বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওগো এ শিশির ওষুধটা কি হ'ল ?"

কোনও জবাব পাইলাম না। আমি স্ত্রীর কাছে গিয়া দেখিলাম তাহার চক্ষু প্রকৃতস্থ নয়, নেশার ঝিমুনির মত তার যেন ঝিমুনি লাগিয়াছে। আমি শঙ্কিত হইয়া তাহাকে খুব জোরে নাড়া দিতেই সে একবার চক্ষু মেলিয়া ঘুমভাঙ্গার মত করিয়া চাহিল। তার পর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "চল্লাম তুমি সুখী হও।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমার স্ত্রী যে Oxalic acidটা খাইয়া বসিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ঔষধের মধ্যে কেবল এইটাতেই "বিষ" বলিয়া লেবেল মারা ছিল, তাই এইটাই সে খাইয়া বসিয়াছে। Oxalic acid তেমন তীব্র বিষ নয়, এই যা ভরসা।

আমি চীৎকার করিয়া ঝিকে ডাকিলাম, ব্যস্ত হইয়া আসিতে, তাহাকে অবস্থা বলিলাম।

সে ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ওষুধ খেয়েছেন ইনি ?"

আমি বলিলাম, "Oxalic acid." দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ঝি বুঝিল। আরও আশ্চর্য্য হইলাম দেখিয়া যে, সে তৎক্ষণাৎ খুব শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর মত আমার স্ত্রীর শুশ্রূষা ও আশু চিকিৎসা করিতে লাগিল। আমি চাকর ও ঠাকুরকে দুইজন ডাক্তারের কাছে পাঠাইলাম, এবং আর একজনকে পাঠাইলাম অতুলের কাছে।

ডাক্তার যখন আসিল তখন ঝির চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আমার স্ত্রীর বেশ জ্ঞান হইয়াছে এবং আমরা দু'জন তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া পায়চারি করাইতেছি। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "না, কোনও ভয়ের কারণ আর বোধ হয় নাই। আপনার First aid অতি চমৎকার হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমি একেবারে আনাড়ি, যা' কিছু বাহাদুরী আমাদের ঝির !"

"ঝির ? বলেন কি ম'শায় ? সে নিশ্চয় পাশকরা নার্শ ! লেখা-পড়া জানে ?"

"জানি না। কিন্তু ওষুধপত্র বেশ চেনে তা' আজ দেখ্‌লাম।"

"Your maid is a Jewel." বলিয়া ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিয়া, শুশ্রূষার ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি অতুলকে সব কথা জানাইলাম এবং ঝির নূতন কীর্ত্তির কথা বলিলাম। সে বলিল, "তুমি ধ'রেছ ঠিক হে। এ স্ত্রীলোকটির ভিতর যে খুব জটিল রহস্য লুকান আছে, তা'তে আর সন্দেহ নাই।"

আমার স্ত্রী ভাল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রোগশয্যায় আমাদের বোঝাপড়া হইয়া গেল। আমি দেখিলাম যে এখন তিনি আমার কথা বলিবার আগেই আমাকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছেন। মৃত্যুর দ্বার হইতে তিনি যেন দিব্য জ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন।

আমি তাঁহাকে অতুলের সঙ্গে যে পরামর্শ হইয়াছিল সে কথা বলিলাম। তিনি তাহা কানেই তুলিলেন না। বলিলেন, "আমি পাগল হ'য়েছিলুম বলে একটা নিরপরাধ স্ত্রীলোক শাস্তি পাবে কেন? আমাকে কি তুমি বিশ্বাস কর না? বিশ্বাসের যোগ্য আমি নিজেকে দেখাইনি স্বীকার করি, কিন্তু এইবারটি আমায় ক্ষমা ক'রে বিশ্বাস ক'রে দেখ।"

আমি তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলাম, "পাগল হ'য়েছ। তোমার দোষ কি যে ক্ষমা করবো পাগল।" তার পর বলিলাম, "শুধু তোমাকে বিশ্বাস করার কথা নয়, এই

ঝিটিকে আমার আর বিশ্বাস হয় না। ওর এখানে না থাকাই মঙ্গল।”

আমার স্ত্রী তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, বলিলেন, “ও ছিল ব’লে আমি বাঁচলুম! ওকে এমন কথা কেমন ক’রে বল্লে? কোনও দিন বেচারা ভাল বই মন্দ কিছু করেনি।”

আমি তখন স্পষ্ট করিয়াই বলিলাম, আমার সন্দেহের কথা। স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “এই যদি তা’র অপরাধ হয় তবে তো সে আমার মাথার মাণিক। তোমাকে যে ভালবাসে সে তো আমার বোনের বাড়া।”

মোটের উপর কিছুতেই আমার স্ত্রীকে আমি এ প্রস্তাবে রাজী করিতে পারিলাম না। নিজের অপরাধের অনুশোচনায় তাঁর মনটি এমন একটা অতিরিক্ত মোলায়েম অবস্থায় ছিল যে সংসারে কাহারও উপর তাঁহার তখন ওরূপ বিরাগ হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

৫

দুই দিন পর সকালবেলায় নীচের কাজ সারিয়া সবে উপরে আসিয়াছি, তখন চাকর আসিয়া খবর দিল, "একটি গেরুয়াপরা বাবু এসেছেন।"

মহাবিরক্ত হইয়া নামিয়া আসিলাম, দেখিলাম গেরুয়া-পরা "বাবু"ই বটে। তাঁহার গেরুয়া বসন সত্ত্বেও তাঁহার কমনীয় কান্তি ও পরিচ্ছন্ন আকৃতি তাঁহাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বাবু প্রমাণিত করিতেছিল। লোকটিকে যেন চিনি-চিনি বোধ হইল। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "অমরচন্দ্র দত্ত।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "অতুলের দাদা?" তিনি একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ"। আমি হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাই নাকি? আপনি কবে এলেন? এই তো অতুল সেদিন আপনার কথা কত বলে গেল।"

"আমি ক'লকাতায় এসেছি ছ'দিন হ'ল কিন্তু এখনো অতুলের সঙ্গে দেখা হয় নি। এ ক'দিন আমি কেবল আমার স্ত্রীর সন্ধান ক'রে বেড়িয়েছি। তা'কে আমি বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছিলাম জানেন বোধ হয় ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমি জানতে পারলাম যে, হয়তো আমি বিনাদোষে তা'কে শাস্তি দিয়েছি। তাই

ক'লকাতায় ছুটে এয়েছি তা'কে খুঁজে বের ক'রতে। তার যে অবস্থাই হ'য়ে থাকুক, সে সতী হ'ক অসতী হ'ক তা'কে গ্রহণ ক'রবো, তার সেবায় জীবন দিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো। সে খুব সম্ভবতঃ এখন পতিতা, কিন্তু যদি সে তা' হয় তা'র জন্যে আমিই দায়ী।" বলিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "এই তো মানুষের মত কথা! তা' আপনার স্ত্রীর সন্ধান পেলেন?"

"পেয়েছি, সে শুনলাম আপনার বাড়ীতেই আছে, আর"—আমার চক্ষের উপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বলিলেন, "শুনলাম তারই জন্য নাকি আপনার স্ত্রী বিষপান ক'রেছিলেন।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, "আমাদের ঝি কমলা। অতুলের বৌদিদি! আমি প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম। তখনি মনে হইল যে এই আগন্তুকের তীব্র দৃষ্টি যেন আমার অন্তর ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রাণে এত আনন্দ হইল যে তাহাতে আমি সঙ্কুচিত হইলাম না। চাকরটা বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "ওরে শীগ্‌গীর অতুল বাবুকে—আরে ঐ যে ব্যারিষ্টার সাহেব—তাকে ডেকে নিয়ে আয়, বল যে তা'র দাদা আর বৌদিদি আমার বাড়ীতে এসেছেন।" অমরবাবুকে বলিলাম, "আপনি যেটুকু

শুনেছেন বল্লেন তা' ঠিক। আর এও ঠিক যে আমা হ'তে আপনার স্ত্রীর কোনও অনিষ্ট হয় নি। আমার স্ত্রী যে ভুল ক'রেছিলেন, তা' তা'র মুখ থেকেই শুনবেন। আপনি একটু মাপ ক'রবেন, আমার স্ত্রীকে খবরটা দিয়ে আসি।" বলিয়া আমি ছুটিয়া ভিতরে গেলাম। আমার স্ত্রী আনন্দের আতিশয্যে সেই ভর দিনের বেলায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার গলা ধরিয়া আমাকে চুম্বন করিয়া ফেলিলেন।

তা'র পর খোঁজ পড়িল ঝির—কমলার। আমার স্ত্রী তাহার নাম ধরিয়া মহাডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। ক্রমে জানা গেল যে, সকাল হইতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। তাহার ঘরের কাছে গিয়া আমরা দেখিলাম দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। আমার স্ত্রীর ডাকাডাকিতে যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন আমার একটা দারুণ সন্দেহে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি দুই তিনটি সবল পদাঘাতে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল।

দেখিলাম কমলা তাহার দীনশয্যায় শুইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। প্রচণ্ড চেষ্টায় সে তখনো নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু আর যেন পারে না। তাহার স্বর্ণকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, আয়ত চক্ষু

বিস্ফারিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে—গণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা দারুণ বেদনার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে।

আমি ছুটিয়া অমরবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। ততক্ষণে অতুলও আসিয়া পৌঁছিল। অমরবাবু ডাক্তারী পাশ, তথাপি আমি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। অতুল নিষেধ করিয়া বলিল, "তা'র চেয়ে, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, তা'তে ক'রে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।" বলিতে-বলিতে আমরা রোগিণীর ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

একটা তক্তাপোষের উপর কমলা শুইয়া ছিল। তার নীচে কতকটা জমি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে নীলরঙের দাগ রহিয়াছে। অমরবাবু সেটা পরীক্ষা করিলেন, রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। শয্যার উপর একটা নীল রঙের ছোট শিশি পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া দেখিলেন; হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "সব চেষ্টা মিথ্যে অতুল, রাক্ষসী বিষ খেয়েছে—একেবারে Corrosive sublimate. আর এর শেষ অবস্থাও হ'য়ে এয়েছে।" এতক্ষণ কমলা স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়াছিল। সে কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, কথা আসিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার যন্ত্রণা যেন কতকটা শান্ত হইয়া আসিল, সে ধপ্ করিয়া বসিয়া

ফেলিল, "তুমি এসেছ ?—আমি অসতী নই—আশীর্ব্বাদ কর—" আর কথা কহিল না।

দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল, অমর ও অতুল ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ও আমার স্ত্রী সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু আমরা নিজেরাই সারা, তাহাদের বুঝাইব কি ?"

কমলার বিছানায় দুইখানা পত্র দেখিলাম। একখানায় আমার স্ত্রীকে লিখিয়াছে, "মা, জন্ম-জন্ম তপস্যার ফলে তোমার মত মা পেয়েছিলুম কিন্তু অদৃষ্টের দোষে আমি তোমার কষ্টের কারণ হ'য়েছি, অবশেষে তোমাকে মেরে ফেলতে ব'সেছিলাম। তাই আমি আমার এ তুচ্ছ দুঃখের জীবন নাশ করাই স্থির ক'রলাম।

আমিও তোমারই মত সৌভাগ্যবতী ছিলাম, কর্ম্মদোষে আজ আমি দুঃখিনী। স্বামীকে দুঃখ দিয়েছি, দেওরকে দুঃখ দিয়েছি, যে আমার সংস্পর্শে এসেছে তাকেই দুঃখ দিয়েছি। এমন হ'য়েও কি বাঁচ্‌তে আছে ?

একটা কথা, মা, ব'লে যাই, বিশ্বাস করো। আমি অসতী নই, আর বাবুর দেবদুর্ল্লভ চরিত্রে তোমার সন্দেহ ক'রবার বিন্দুমাত্রও হেতু নাই। ইতি—

দাসী—

কমলা।"

অতুলের কাছে কমলা যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা এই—

"কল্যাণীয়েষু—

ঠাকুরপো, কি ধূমকেতু হ'য়েই আমি সংসারে এসেছিলাম, যেখানে গেলাম সব পুড়িয়েই গেলাম। তাই আজ চ'ল্লাম, আমাকে ক্ষমা করো ভাই। আর, যদি কখনও তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তা'কেও আমায় ক্ষমা ক'রতে বলো।

যে আশায় আমি এতদিন এ দুঃখময় কলঙ্কিত জীবন ধারণ ক'রেছিলাম, সে আশা আমার পূর্ণ হ'ল না। এই বড় দুঃখ বইল। মরবার আগে তোমার দাদাকে ব'লে মরতে পেলুম না যে, আমি অসতী নই, অদৃষ্টদোষে যে কলঙ্ক আমার ঘাড়ে চেপেছে, তা'তে আমার কোনও দোষ নাই। এ জগতে কেউ পাছে সে কথা না জানে তাই জগতের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সব কথা তোমাকে ব'লে যাচ্ছি। তুমি সেদিন আমাদের বাবুকে বলে'ছিলে, তুমি এখনো আমায় ভালবাস। সেই ভরসায় আমি তোমাকে ভার দিয়ে গেলুম জগতের কাছে আমার কলঙ্ক ক্ষালন করবার।

এ পৃথিবীতে কেউ আমায় ঠিক বুঝলে না, আমি যেন কেবল ভুলের জয় করবার জন্যই এসেছিলুম। তোমার দাদা আমাকে কুলটা ব'লে জানলেন, তুমি জানলে আমি

তোমায় ভালবাসি, আর সেদিন আড়াল থেকে শুনলাম, আমাদের বাবুও মনে করেন যে বুঝি আমি তাঁ'কে ভাল-বাসিয়া মরিয়াছি। কিন্তু সত্য কথা ভাই, আমি তোমার প্রেমে পড়ি নাই, এ জীবনে সত্য করিয়া তোমার দাদাকে ছাড়িয়া কাউকেই ভালবাসি নাই।

কিন্তু বিয়ের আগে, যখন ভালবাসা কাকে বলে ঠিক জানতুমই না, তখন আমার মনটা বেশ একটু চঞ্চল হ'য়েছিল চঞ্চলের জন্য। শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য হ'বে, আমিও এখন আশ্চর্য্য হই, যে তা'র সঙ্গে যখন আমার বিয়ে ভেঙ্গে গেল তখন আমি গোপনে গোপনে অনেক কেঁদেছিলাম। চঞ্চলও তা'র পর একদিন আমাকে ব'লে গিয়েছিল যে, সে আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রবে, তবু সে আমায় বিয়ে ক'রবেই।

ঠিক তারই আগে তোমার দাদা এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। তখন তোমার দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, তিনি খুব গোপনে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন। তাঁর উপর বরাবরই আমার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তার পর যখন তিনি এই সকলের লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত বিধবার মেয়েটিকে নিজের পায় ঠাঁই দিতে রাজী হ'লেন, তখন আমার প্রাণমন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌লো। তবু বিয়েতে ততটা মন ছিল না। চঞ্চলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা অনেক দিন চ'লেছিল ব'লেই আমি এক রকম তা'কেই

স্বামী সাব্যস্ত করে, এত কল্পনা ক'রেছিলাম যে, যখন তার সঙ্গে বিয়ে হ'ল না তখন আর কারু সঙ্গে বিয়ের কথা আমার ভাল লাগ্‌তো না।

তোমার দাদা পা টিপে-টিপে আমার কাছে এলেন। মা তখন তোমাদের বাড়ীতে, আমি তখন ঘরে একা। তিনি আমায় বল্লেন, "কমলা, তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

আমি পোড়ারমুখী তখনও ভালবাসার মর্ম্ম জানি না, তাই বলিতে পারিলাম না, "হাঁ।" আমি লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া রহিলাম।

তোমার দাদা আমার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, আমি দেখিলাম তাঁর সমস্ত মুখ ভালবাসায় ভরপুর হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয়ের ভালবাসা লইয়া আমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, "আমার মুখের দিকে চেয়ে বল কমল, আমার সঙ্গে বিয়েতে তোমার সম্পূর্ণ মত আছে তো ?"

আমার মনে যাহাই থাকুক আমি বলিলাম, "হাঁ।"

"না" বলিতে পারিলাম না। এত আশাকে বিমুখ করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, তোমার দাদা দেবতা, আমার মত নগণ্য কীটকে দয়া করে পায় স্থান দিচ্ছেন, তাঁর মনে আমি কেমন ক'রে কষ্ট দিব ? তাই বলিলাম, "হাঁ।" তুমি ভুল বুঝিও না। আমি গরীবের মেয়ে, আমার বিয়ে হয় না তাই হাঝাতের মত তোমার

দাদার ঐশ্বর্য্য হাত করবার জন্য আমি সম্মতি দিয়েছিলাম, একথা মনে করিও না।

ওঃ! এ কথায় তাঁর যে পরিতৃপ্তির আনন্দ, তা কেবল আমিই দেখিলাম। মনে বড় ব্যথা পাইলাম। এমন দেবতাকে কি আমি ঠকাইয়া যাইব? কখনই না, সঙ্কল্প করিলাম, তাঁহাকে ভালবাসিবই। সমস্ত জীবন মন দিয়া ভালবাসিয়া সেবা করিয়া তাঁর এ অভাগিনীর প্রতি ভালবাসার সামান্য প্রতিদান দিব। সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখিয়াছিলাম।

ঠিক তা'র কিছুক্ষণ পর চঞ্চল আসিল। এখন বুঝি যে, নভেল পড়িয়া তা'র মাথা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, সে কেবল নভেলের দু'টো বাঁদিগৎ মুখস্থ বলিয়া গেল। কিন্তু তখন সে কাঁদিয়া গেল, আমাকে কাঁদাইয়া গেল। কাচের বদলে মুক্তা পাইয়াও আমার তখন মনে হইল আমি ঠকিয়া গেলাম। বড্ড কাঁদিলাম। তার পরেও অনেক দিন একলা-একলা তা'র কথাগুলি স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম, এখন ভাবিতে হাসি পায়।

যে দিন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে সেদিনও আমি চঞ্চলের কথা ভাবিয়াই কাঁদিতেছিলাম, আমি দেখিতে পাইলাম তুমি ভুল বুঝিয়া গেলে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কি সত্য কথা এ অবস্থায় মেয়েছেলে বলিতে পারে?

বিবাহের পর তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, আমি

বুঝিলাম, কেন তোমার এত তাড়াতাড়ি বিলাত যাওয়ার দরকার হইয়াছিল। কিন্তু তোমার অভাব আমার অনুভব হয় নাই। তোমার দাদা তাঁর ভালবাসা দিয়া আমাকে একেবারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—কত যে আদর, কত যত্ন তিনি করিতেন, সময় নাই, অসময় নাই, কত ভাবে যে তিনি আমার কাছে তাঁর ভালবাসার অনন্ত প্রস্রবণ ছাড়িয়া দিতেন তাহা স্মরণ করিতে আমার এ দুঃখের দশায়ও শরীর পুলকিত হয়।

আমি দেখিলাম যে আমার প্রতিজ্ঞাপালন মোটেই কঠিন হইল না। চঞ্চলের মোহ একটা দূর স্বপ্নের মত হইয়া উঠিল, তোমার দাদা আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া রহিলেন।

এ বিষয়ে সাহায্য করিল চঞ্চল। কিন্তু তাতেই যত দুঃখ আসিল। আমার বিবাহের পর চঞ্চলের প্রেম একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিল, সে আমাকে প্রেম-পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম পত্র পাইলাম বিবাহের দুই মাস পরে। তখন তোমার দাদা আমার মন দখল করিয়া লইয়াছেন কিন্তু চঞ্চলের কথা মন হইতে একেবারে সরিয়া যায় নাই। আমি তখন রান্না করিতেছিলাম। স্বামী নিজে চিঠিখানা দিয়া গেলেন। আমি পড়িয়া পত্রখানা আগুনে ফেলিয়া দিলাম। বড় ভয় হইল, চঞ্চলের উপর বড় রাগ ও ঘৃণা হইল।

তার পর প্রায়ই তা'র চিঠি আসিতে লাগিল। আমি

সব চিঠি গোপনে অগ্নিসাৎ করিতাম। প্রত্যেকটি চিঠি পাইলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, চঞ্চলের উপর ঘৃণায় মন ভরিয়া যাইত, তার কথা মনে হইলে সমস্ত অঙ্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।

কিন্তু আমি তোমার দাদাকে কিছু বলি নাই। বুঝিয়াছিলাম, যে তাঁর কাছে এ কথা আমার বলা উচিত, কিন্তু বলি বলি করিয়া কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। একদিন দেখিলাম তোমার দাদা চঞ্চলের একখানা চিঠি আনিয়া দিলেন। তাঁহার সাম্‌নে আমি তাহা খুলিলাম না, ভয়ে। তিনি চলিয়া গেলে খুলিলাম—কি দুর্ম্মতি আমার হইল আমি চিঠিখানা পড়িলাম, পড়িয়া আগুনে ফেলিয়া দিলাম। ফেলিয়াই শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরাইলাম, দেখিলাম যে, তোমার দাদা তাঁর ঘরের জানলায় দাঁড়াইয়া আমার কার্য্য দেখিতেছেন।

সে চিঠি ভাল করিয়া পড়ি নাই, কিন্তু এটুকু দেখিয়াছিলাম যে, চঞ্চল আমাকে কখন যেন কোথায় যাইয়া তাহার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে লিখিয়াছে। পরে বুঝিয়াছি যে, সে সেইদিন বৈকালেই খিড়কীর পুকুরে আমাকে যাইতে লিখিয়াছিল এবং তোমার দাদা সে চিঠি পড়িয়াছিলেন। এই প্রস্তাবটার উত্থাপনেই আমার এমন ঘৃণা হইয়াছিল যে সমস্তটা কথা আমি পড়িলেও সে কথা আমার মনের ভিতর প্রবেশ করে নাই।

সেইদিন বৈকালে আমি যথাসময়ে খিড়কী পুকুরে গা ধুইতে গেলাম। গা ধুইয়া ভিজাকাপড়ে ফিরিতেছি, হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল হইতে চঞ্চল বাহির হইল। "এই যে এসেছ!" বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া—এখনো লিখিতে গা শিহরিয়া ওঠে—চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে লাগিল। আমি এত ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলাম যে, আমার মুখে কথাটিও ফুটিল না, আর এত দ্রুত এই সব কাণ্ড হইয়া গেল যে, আমি সংজ্ঞা পাইবার অবসরও পাইলাম না। নিমেষ মধ্যে সে কি দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। আমি তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, দূরে জানালায়, আমার স্বামী! তখন আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিল, আমি ভিজা কাপড়ে সেইখানে বসিয়া পড়িলাম! সমস্ত ব্যাপারটা আমার চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া গেল। চঞ্চল চিঠিতে ঠিক সময়ে আমাকে আসিতে লিখিয়াছিল এবং এই ঝোপের আড়ালে সে অপেক্ষা করিতেছিল। তোমার দাদা সে পত্র পড়িয়াছিলেন এবং আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমি যতক্ষণ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইতে-ছিলাম,—কি লজ্জা—ততক্ষণ চঞ্চল নিভৃতে বসিয়া আমাকে দেখিতেছিল। আর—সমস্তই স্বামী দেখিয়াছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, এই সমস্ত ব্যাপারে আমি স্বামীর চক্ষে যে অপরাধিনী হইয়া গেলাম, হাজার

কথায় সে মনোভাব দূর করা আমার সাধ্য হইবে না।

আমি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মন স্থির করিলাম। আমার স্বামী এ অবস্থায় যদি আমাকে চাবুক মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেন, তবে আমার কিছু বলিবার নাই, স্থির করিয়া আমি বাড়ীতে ঢুকিলাম।

সে দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল না। তিনি রাত্রে কখন যে আসিলেন এবং ভোরের বেলায় কখন যে চলিয়া গেলেন জানিলাম না। পরদিন সকালবেলায় তিনি আমার কাছে আসিলেন। আমি লজ্জায় দুঃখে মরিয়া গিয়া আমার এ কলঙ্কিত দেহ যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া শাস্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন আমার নিজের জন্য আমার কোনও দুঃখ ছিল না। এত বড় মন যার, যথাসর্ব্বস্ব যে আমাকে দিয়া সুখী, তার মনে এত বড় দুঃখ হইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। তাঁর চোখের ভিতর তাঁর মনের বেদনা দেখিতে পাইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি এমন অবস্থায় পড়িয়াছিলাম যে কথা বলিয়া তাঁর দুখ নিবারণ অসম্ভব। যদি আমাকে শাস্তি দিয়া তাঁর মনের দুঃখ কিছু কমে তবে সে শাস্তি আমার মাথার মাণিক হইবে, এই ভাবিয়া আমি শাস্তির প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলাম। কিন্তু তিনি শাস্তি দিলেন না, কেবল বলিলেন, "ওগো, আজ আমায় দার্জ্জিলিং যেতে হ'বে। ৫।৬ দিন বাদে ফির্‌বো। জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে দিও।"

স্বামী চলিয়া গেলেন। তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বুকের দুঃখ বুকে চাপিয়া তিনি আমার মত হতভাগিনীর জন্য কি যাতনা পাইতেছেন তাই ভাবিয়া কাঁদিলাম। কি করিলে এ দুঃখ যায় কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে আমাদের যা' সম্বল তাই স্থির করিলাম—ভাবিলাম মরিব। এই আমার সুযোগ, স্বামী বাড়ী থাকিবেন না, এই সময় মরিব।

স্বামীকে বিদায় দিয়া ঘর দুয়ার গোছাইলাম। তখন আর আমার মনে কোনও গ্লানি ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ঘরে ঢুকিলাম, দাসীকে বলিয়া দিলাম, আমি আজ আর খাইব না, আর আমার ঘরেও তার শুইয়া কাজ নাই।

তখন দারুণ গ্রীষ্ম, দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল, ঝির-ঝির করিয়া বাতাস আসিতেছিল, তাহার পাশে আমাদের বিছানা। একবার জীবনের শোধ সেই বিছানায় পড়িয়া স্বামীর গায়ের আঘ্রাণ অনুভব করিলাম, উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা জানি না।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম আমার স্বামী

ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমার পাশে শুইয়া আমাকে আদর করিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "ছি মরিবে কেন? তোমার কি দোষ? আমি তো তোমার উপর রাগ করি নাই।" বলিতে বলিতে কতবার আমার মুখচুম্বন করিলেন। আমি আদরে গলিয়া গিয়া গভীর আলিঙ্গনে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইলাম।

হঠাৎ একটা চাবুকের ঘায়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিতে পাইলাম আমার স্বামী শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাগলের মত চাবুক চালাইতেছেন আর আমার আলিঙ্গন পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আহত চঞ্চল তড়াক করিয়া জানালা ডিঙ্গাইয়া পলাইলেন। আমার ঘুমের ঘোর কাটিবার পূর্ব্বেই এত সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তখন আমি ভাল করিয়া সব ব্যাপার বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু কলের পুতুলের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম, আমার স্বামী আমার দিকে আগুনের মত চোখ করিয়া চাহিয়া কেবল আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চমক ভাঙ্গিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিলাম। আমার স্বামীর দার্জ্জিলিং যাওয়াটা একটা ছল, আমরা তিনি না থাকিলে এমনি একটা কিছু করিব জানিয়াই তিনি এ ছল করিয়াছিলেন। চঞ্চল, তিনি নাই জানিয়া, রাত্রে জানালা দিয়া সিঁড়ি ফেলিয়া ঘরে আসিয়া আমার পাশে শুইয়াছিল—তাহাকেই আমি তোমার দাদা মনে করিয়াছিলাম আর ঘুমের ঘোরে

আলিঙ্গন করিয়াছিলাম; আমার তখন জ্ঞান ছিল না। কি করিতেছি না জানিয়া স্বামীর পায়ের উপর পড়িতে গেলাম। সাপ দেখিলে মানুষ যেমন লাফাইয়া যায় তিনি তেমনি লাফাইয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। আমি উঠিয়া বসিলাম। হৃদয় একেবারে জড় হইয়া গিয়াছিল, কান্না পাইল না।

তিনি কঠোরভাবে বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।" আমি নীরবে অনুসরণ করিলাম। তিনি সুপ্ত নীরব অট্টালিকার ভিতর দিয়া গিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"ওই রাস্তা, ওইখানে তোমার স্থান। আর তুমি আমার কাছে দেখা দিও না।"

আমি কলের পুতুলের মত বাহির হইয়া গেলাম। তখন তিনি কি ভাবিয়া পকেট হইতে একখানা ৫০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া আমার দিকে ছুঁড়িয়া ফটক বন্ধ করিলেন। আমার স্বর্গের দুয়ার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইল।

তখন আমার হুঁস হইল। আমি খানিকক্ষণ সেই রুদ্ধ দুয়ারের চৌকাটে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিলাম। আমি মরিতে চলিলাম, আমার তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমার স্বামীর আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়া গেলাম, আমার দেবতাকে আমি কি কষ্ট না দিলাম, তাই ভাবিয়া কাঁদিলাম। খানিক বাদে আমার হঠাৎ ভয় হইল।

চঞ্চল যদি কাছে কোথাও লুকাইয়া থাকে তবে তো সর্ব্বনাশ! এই প্রকাণ্ড বিশ্বের মধ্যে আমার একমাত্র ভয়ের জিনিস ছিল সেই। তাই আমি উঠিলাম, কোথাও পালাইব বলিয়া পথে চলিতে লাগিলাম।

মরিব তো কিন্তু কেমন করিয়া মরিব? জলে ডুবিয়া মরিতে হইলে দড়ি কলসীর আবশ্যক জানিতাম, তাহা এখন কোথায় পাইব? না বিষ খাইব? বিষই বা পাইব কোথায়? আমি ফিরিলাম। তোমার দাদা যে নোটখানা দিয়াছিলেন তাহা কুড়াইয়া লইলাম; তার পর খানিক রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম, চঞ্চলের কাছ হইতে দূরে যাইবার জন্য। তার পর সোজা রাস্তা দিয়া কেবলি চলিতে লাগিলাম। আমার সৌভাগ্য! কাহারও সঙ্গে পথে দেখা হইল না।

অনেক দূর চলিয়া সামনে দেখিলাম ট্রামের লাইন। মনে হইল এই তো বেশ সুযোগ। ট্রাম আসিলে তার সামনে লাফাইয়া পড়িব, তবেই সব যন্ত্রণার অবসান হইবে। তখন কত রাত্রি জানি না, অনেকক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, ট্রাম আসিল না। বিরক্ত হইয়া আমি আবার চলিতে লাগিলাম। সামনে একটা পুকুর দেখিয়া সেখানে গিয়া গলার সঙ্গে দুইখানা ইট কাপড় দিয়া বাঁধিয়া জলে ডুবিলাম। ইট দুইটা বড় হাল্কা বোধ হইল, তাও আবার কেমন করিয়া গলিয়া বাহির

হইল, ভিজা কাপড় দিয়া আর তাহাকে ভাল করিয়া বাঁধিতে পারিলাম না। তবু অথৈ জলে গিয়া ডুবিয়া রহিলাম। খানিক বাদেই শরীরটা ভাসিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস লইবার জন্য মুখ তুলিলাম, আবার ডুবিলাম। ভাসিয়া থাকিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিলাম না বলিয়াই আমি কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পর বিরক্ত হইয়া মনে করিলাম উঠিয়া যাই। আমি একটু একটু ডুব সাঁতার দিতে পারিতাম, তাই সহজেই তীরে উঠিলাম। সম্মুখে দেখিলাম ময়দান। আমি চলিতে লাগিলাম। খানিক চলিতেই শীত বোধ হইল, আর পাও চলে না, তাই এক জায়গায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। তখন দুঃখে হাসি পাইল। কিসের জন্য পালাইব, বৃষ্টিতে আমার কি ভয়? আমি আবার শুইয়া পড়িলাম। ক্রমে শীতে কাঁপিতে লাগিলাম, কখন যে ঘুমাইয়া বা অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম তাহা জানি না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন আমি মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে। শুনিলাম এক ভদ্রলোক সকালে বেড়াইতে গিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া এখানে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমি বিষম জ্বরে অজ্ঞান, আমার গোটা

ফুস্‌ফুস জুড়িয়া নিউমোনিয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, "এই ভাল, মরিবার আগে তাঁকে খবর দিয়া আনিয়া বলিতে পাইব আমি অসতী নই।"

কিন্তু মরণ হইল না। মাস খানেক ভোগের পর ডাক্তারের হুকুমে আমাকে হাঁসপাতাল হইতে বিদায় করা হইল। বিদায় তো হইলাম, এখন যাই কোথায়। একটি বর্ষীয়সী ইংরাজ নার্স আমাদের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় দয়া করিতেন, তাঁর নাম মিলড্রেড। আমি তাঁকে মা বলিতাম। তাঁহাকে বলিলাম, "মা, আমার কোথাও স্থান নাই, আমি কোথায় যাই।"

খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি শেষে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। নার্সদের থাকিবার বাড়ীতে একতালার একখানা ঘরে আমি থাকিতাম আর নার্স মিলড্রেডের অধীনে রোগী শুশ্রূষার কাজ করিতাম। নার্স মিলড্রেড আমাকে রোগীচর্য্যা অনেক শিখাইয়াছিলেন।

মরিবার আশা তখনও ত্যাগ করি নাই, কিন্তু তখন মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আবার যে আমার সৌভাগ্য ফিরিবে এমন আশা আমার একদিনের তরেও হয় নাই, আমার এ কলঙ্কিত দেহ দিয়া স্বামীকে কলুষিত করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে জন্মের মত এমন একটা দাগা রাখিয়া মরিতে মন ছিল না। বড় সাধ ছিল মরিবার সময় তাঁহার পায় মাথা রাখিয়া বলিব,

"আমি অসতী নই"—তখন তিনি আমাকে বিশ্বাস করিবেন এ ভরসা আমার ছিল। সেই আশায় এত দিন এত কষ্টে বাঁচিয়া ছিলাম। কিন্তু সে সাধ আমার মিটিল না।

সেখানে বেশ ছিলাম। কিন্তু বছর খানেক বাদে আমার সে স্থান ছাড়িতে হইল। আমাদের ওখানে জারট্রুড নামে একটি যুবতী নার্স ছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বাহির হইতেন এবং খুব বেশী রাত্রে প্রায় একটা না একটা সাহেবের সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে আসিল একটা ট্যাক্সিক্যাবে একটি যুবক, যা'কে দেখিয়াই আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তার সাহেবী পোষাক এবং কামান গোঁফ সত্বেও আমার চিনিতে বাকী রহিল না। সে চঞ্চল।

চঞ্চল তার পর রোজ আসিতে লাগিল এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জারট্রুডের সঙ্গে মদ টদ খাইয়া হাস্তালাপ করিয়া যাইতে লাগিল। আমার ঘরের পাশ দিয়া তারা যাতায়াত করিত, আমার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। কি যে এক সৃষ্টিছাড়া ভয় আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল জানি না, তাহাকে দেখিলে আমার অঙ্গ হিম হইয়া যাইত।

অবশেষে আমি স্থির করিলাম এ স্থান ছাড়িব। একদিন রাত্রে দুইখানা মাত্র কাপড় এবং তোমার দাদার দেওয়া সেই নোট ও আমার মাইনার কিছু টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মোড়ে এক পাণওয়ালীর সঙ্গে

আলাপ করিয়া তার বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। দেখিতে পাইলাম সে স্থানটি নরক, কিন্তু পাণওয়ালী লোক ভাল। চঞ্চল ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকেই তখন আমার ভয় ছিল না, কেন না আমি হাঁসপাতাল হইতে চুরি করিয়া এক ব্রহ্মাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম—এক শিশি করোসিভ সাব্লিমেটের ট্যাব্লয়েড্।

আমি সেই খানেই পাণওয়ালীর আশ্রয়ে থাকিতাম। আমি তাহার পাণ বাড়ী বসিয়া তৈয়ার করিয়া দিতাম সে বেচিত। আমাকে কেহ বড় বিরক্ত করিতে আসিত না, বরং দুই একটি বারনারী বেশ একটু সহৃদয়তা দেখাইত।

বুড়ী পাণওয়ালী মরিয়া গেল, আমি তা'র ঘরে থাকিতে লাগিলাম। পান বেচিতে আমার সাহস হইল না, কিন্তু আর একজন পানওয়ালীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম, কিছু দিন তা'তেই চলিল। একদিন দেখি চঞ্চলবাবু একখানা মোটরকারে করিয়া দুই তিনটি ইয়ার সঙ্গে করিয়া আমাদের বাসাতেই উঠিলেন! তখন সেখান হইতে কাজে কাজেই বাস উঠাইতে হইল।

এইবার স্থির করিলাম মরিব। যে বাসায় গেলাম সেখানে কতকগুলি ঝি থাকিত, তাহাদের একজনকে তোমাদের বাসার খবর আনিতে পাঠাইলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিল, তোমার দাদা নিরুদ্দেশ। আমার মরা হইল না। কিন্তু বাঁচিবারও আর উপায় ছিল না, কারণ হাতে

তোমার দাদার দেওয়া নোটখানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর তা' ছাড়া চঞ্চলের জ্বালায় সব জায়গা হইতে তাড়িত হইয়া আমার মনে হইল, একজন ভদ্রলোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদে থাকিতে পারিব। আমি বাড়ীওয়ালীকে বলিলাম আরও সবাইকে বলিলাম আমি কাজ করিব। তা'র পর পাশের বাড়ীর দয়াময়ী ঝি আমাকে এখানে জুটাইয়া দিল।

সেদিন আড়াল হইতে আমি আমাদের বাবুর আর তোমার কথা-বার্ত্তা শুনিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। সুতরাং জানি যে আমি এখানে কি অবস্থায় আছি তা' তুমি জান। রাক্ষসী আমি, এমন দয়াময়ী আশ্রয়দাত্রীকে খাইতে বসিয়াছিলাম।

আর পারি না। এখানে আমার আর থাকা অসম্ভব। আমার অমঙ্গল দিয়া আর কত লোকের সর্ব্বনাশ করিব? অথচ আর কোথাও যাইতেও প্রবৃত্তি নাই, এ কয় বচ্ছর যে নরকের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি আর তাড়িত কুকুরের মত যে কষ্ট পাইয়াছি, তা'র ভিতর ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই। একবার ভাবিয়াছিলাম, তোমারই আশ্রয় লইব। কিন্তু তখনই সে কথা মন হইতে দূর করিয়াছি। তোমার দাদার হুকুম না পাইলে আমি ও বাড়ীর চৌকাট ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারি না। তা' ছাড়া তুমি আমায় ভাল বাস শুনিলাম, তোমাকে আবার পরীক্ষার ভিতর ফেলা

আমার উচিত হইবে না। সবার উপর, আমি এ কয় বচ্ছর যে সব স্থানে থাকিয়াছি সেখান হইতে যে আমি পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আসি নাই, সুধু মুখের কথায় কি কেউ কখনো তাহা বিশ্বাস করিত?

তাই তোমার দাদাকে দেখিবার আশা, তাঁর প্রাণে একটু শান্তি দিবার আশা ছাড়িয়াই মরিতে হইল। এই মস্ত অমঙ্গলের আকরটাকে আর পৃথিবীতে থাকিতে দেওয়া চলে না।

চলিলাম ভাই। সব কথা তো শুনিলে, এখন তুমি বিয়ে ক'রে সুখী হও এই আশীর্ব্বাদ করি। যদি তাঁর কখনো দেখা পাও, তবে তাঁকেও একটা যোগ্য পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রতে চেষ্টা করো। তাঁর হৃদয়ে কত ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা সে কেবল আমিই জানি, সে আকাঙ্ক্ষা আমি তৃপ্ত ক'রতে পারলাম না, যদি কোনও ভাগ্যবতী এসে তা' পারে তবে আমি পরলোকে সুখী হব। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা

কমলা।

কমলার Post mortem পরীক্ষার পর তাহার অন্ত্যেষ্টি সারিয়া যখন দুই ভাই গৃহে ফিরিল তখন কিছুক্ষণ তাহারা কেউ কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। আমি বুঝিলাম যে অতুলের মন দাদার উপর একেবারে বিষাক্ত হইয়া রহিয়াছে। তখনও তাহারা কেহ কমলার পত্র দেখিতে পায় নাই।

এ পত্র আবিষ্কার করেন আমার স্ত্রী। আমরা যখন কমলার দেহ লইয়া চলিয়া গেলাম, তখন তিনি বাড়ীতে একা বসিয়া পত্র দু'খানি পড়িয়াছিলেন। আমি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম তিনি পত্র দু'খানা হাতে লইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন। আমি তাঁকে কোনও মতে সান্ত্বনা দিয়া চিঠি লইয়া অতুলের বাড়ী গেলাম।

আমি গিয়া দেখিলাম দুই ভাই বৈঠকখানার দুই ধারে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। খানিক বাদে অতুল বলিল, "দাদা তোমার বিষয়-আশয় তুমি বুঝে নেও।"—

"আর তো দরকার নেই ভাই!" বলিয়া অমর কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যা'ব।"

অতুল বলিল, "সে কেমন ক'রে হ'বে এখনো যে অনেক হাঙ্গামা র'য়ে গেছে। Coronerএর inquest

শেষ হ'বার আগে যাবার কোনই উপায় নাই।—আর তোমার বিষয় আমি রাখতে পারবো না। তুমি না নেও তোমার যা'কে খুসী বিলিয়ে দাও, আমি ওর একটি পয়সাও ছোঁব না।"

অতুলের মনে কি অভিযোগ খোঁচা দিতেছিল, আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, "আপনার স্ত্রীর বাক্সের ভিতর এই চিঠি দু'খানা পাওয়া গেছে।" বলিয়া পত্র দু'টি অমরবাবুকে দিলাম। তাঁহার অনুরোধে পত্র আমি তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইলাম। পত্র শেষ হইলে দেখিলাম, অতুলের দু'চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতেছে। অমরবাবু দাঁত দিয়া জোরে তাঁর অধর চাপিয়াছেন, তাঁর চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার সব কটা শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

অতুল অমরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা",—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। দু'ভাইয়ে তখন খুব খানিকটা কাঁদিল, আমি নীরবে চোখ মুছিলাম।

অবশেষে অমরবাবু বলিলেন, "কি দারুণ পরিহাস অদৃষ্টের, আমি—যার কমলা ছাড়া প্রাণ ছিল না, মন ছিল না, সেই আমি কিনা তা'কে রাস্তায় বের ক'রে দিলাম, শেষে তা'কে বিষ খাইয়ে মারলাম!"

খানিক পরে অতুল বলিল, "এতদিন তুমি ছিলে কোথায় দাদা। তোমার খোঁজ যে কত ক'রেছি তা' কি ব'লবো। যদি দু'দিন আগে আসতে তবে তো বৌদি' আজ যেত না।"

অমর বলিলেন, "আমি যেখানে ছিলাম সেখানে তোমার কোনও খোঁজ সন্ধানই পৌছায় না। আমি নাগা-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। সাধনার চেষ্টা ক'রেছি পারি নি। গুরুর কাছে দীক্ষা চেয়েছি তিনি আমার মন শান্ত না হ'লে দীক্ষা দেবেন না ব'লে এতদিন দীক্ষা পাই নি। তবে দয়া ক'রে তিনি আমায় সঙ্গে রেখেছেন।"

আমি একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, "আপনি ফিরলেন কেন?"

"প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এসেছিলাম গুরুজীর সঙ্গে। সেখানে এই চঞ্চলটা গিয়েছিল দৃশ্যটা দেখতে। সেখানে গিয়ে তা'র ওলাউঠা হয়—সে আমাদের আখড়াতেই সেদিন ছিল। আমার শুনে একটা পৈশাচিক আনন্দ হ'ল, তা'কে গিয়ে ব'ললাম, 'তোমার ওলাউঠা হ'য়েছে, তুমি বাঁচবে না, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।' সে চমকে উঠলো। আমার গলার আওয়াজ শুনে আমাকে চিনতে পারলো, ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে, 'কোন্ পাপের কথা ব'লছেন।'

'কমলাকে যে পাপে ডুবিয়েছ তার।'

সে নীরব রইল, পরে বল্লে, 'কি প্রায়শ্চিত্ত বলুন।' আমি বলিলাম, 'বলছি, তা'র আগে তুমি বল কমলাকে কোথায় রেখেছ?' আমার মনে সন্দেহও ছিল না যে কম-

তাকে আমি যখন বের ক'রে দিলাম তখন সে নিশ্চয় চঞ্চলের কাছে গিয়েছিল। চঞ্চল বল্লে, 'আমি তো তার কথা জানি না; সেই আমার তা'র সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।'

আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম, বল্লাম, 'কমলা তোমার কাছে যায় নি সে রাত্রে?'

চঞ্চল বলিল, 'না'। তারপর সে নিজেই বল্লে, 'আমি এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কমলা সাধ্বী, আমি তাকে নষ্ট ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু তার কোনও দোষ নাই।'

আমি বল্লাম, 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। মরতে বসেছো এখন ভাঁড়াবার চেষ্টা করো না।' তোমার চিঠি পেয়ে যে খিড়কীর পুকুরে সে গিয়েছিল, আর সেখানে যা' হ'য়েছিল তা' তো আমি নিজ চক্ষে দেখেছি, আর তা'র পর, সেদিন রাত্রে—ব'লতে লজ্জা করে না এখনো মিথ্যা কথা?'

'সেদিন রাত্রে তার কোনই দোষ ছিল না। সে ঘুমিয়ে ছিল, আমি দারোয়ানকে ঘুস দিয়ে জানালায় সিঁড়ি ফেলে উঠে তার পাশে গিয়ে শুয়েছিলাম। আপনি আসবার আগে পর্য্যন্ত তার ঘুম মোটেই ভাঙ্গে নি, সে টেরও পায় নি যে আমি সেখানে আছি। আর সেদিন বাগানে সে যে রকম চমকে গিয়েছিল তা'তে আমার তখনি মনে হ'য়েছিল যে বুঝি বা আমি ভুল বুঝেছি। আমি তা'কে

অনেক চিঠি লিখেছি, কোনও চিঠির সে কোনও রকম উত্তর কখনো দেয় নি। সেদিন সে যে আমার চিঠি পেয়ে এসেছিল আমার তো মনে হয় না।'

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল চঞ্চলের কথা তো সত্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়! আমি ছুটিয়া গুরুজীর কাছে গেলাম। যেতেই তিনি বল্লেন, 'তুমি ফিরে যাও, এতদিন একটা অন্ধ বিশ্বাসে কষ্ট পেয়েছ, আজ দেখছি তুমি সত্য কথা জানতে পেরেছ,—কিন্তু আবার তোমায় আসতে হ'বে।'

আমি সেই দিনই রওনা হ'লাম। এসে প্রথমে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে সেই সময়কার ক'খানা খবরের কাগজ বের ক'রে দেখতে লাগ'লাম যে কোথায় কোনও মেয়েছেলের অপমৃত্যু হওয়ার দুর্ঘটনার কথা আছে কিনা। দেখলাম, একটা ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েকে গড়ের মাঠে মৃতবৎ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। রোগিণী হাঁসপাতালে আছে। হাঁসপাতালে অনেক খোঁজ ক'রে গেলাম নার্স মিলড্রেডের কাছে। সেখানকার একজন উড়ে বেয়ারার কাছে খবর পেয়ে সেই পাণওয়ালীর বাড়ী গেলাম। তার পর ঘুরতে ঘুরতে এলাম আপনার বাড়ী। এসে দেখলাম সন্ধান না পেলেই ছিল ভাল।"

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

—মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহান্ উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্টী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি এক সঙ্গে বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৵০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৵/০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ
৩। পল্লীসমাজ (৯ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম এ
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
৯। বড়বাড়ী (৮ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা